মানসী

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

Scanned with CamScanner

ওঁ

মানসী

স্নেহের-ভাই অমরেন্দ্রের
হাতে —
দাদা

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

Scanned with CamScanner

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীঅনুরাণী দত্ত
"বাণী প্রেস"
কাটোয়া : বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ :
১৫ আগষ্ট, ১৯৭৪

মুদ্রন করেছেন :
"কর্ম্মীবৃন্দ"
বাণী প্রেস : কাটোয়া

দাম : দুই টাকা মাত্র।

Scanned with CamScanner

॥ উৎসর্গ ॥

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী
পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি
সুসাহিত্যিক, দরদী শিক্ষাব্রতী, বাগ্মীবর
মৌলভী রেজাউল করিম সাহেবের
শ্রীকরকমলে—

মাষ্টার মহাশয়,

একদা তোমারি অনুপ্রেরণায় নব অনুভূতি ল'য়ে
কবিতা লেখার হাতে খড়ি মোর জাতীয় বিদ্যালয়ে।
কিশোর মনের অপটু রচনা আগ্রহে সমাদরে
শুনিতে পড়িতে, উৎসাহ দিতে সহজাত স্নেহভরে।
দেশ-মাতৃকার সেবাব্রত-পাঠ নিয়েছিনু তব ঠাঁই
সে ব্রত সাধনে পথ-পরিক্রমা জীবন ভরিয়া তাই।
আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা লক্ষ্য পথে অবিচল
তোমারি জীবনে হেরিয়াছি আমি লভিয়াছি মনোবল।
সে পথে চলিতে গুটিকত ফুলে সযতনে গাঁথা মালা
তোমারি শ্রীকরে সমর্পিনু আজ শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য-ডালা।

সেবক
বিভূতি

Scanned with CamScanner

ঃ ভূমিকা ঃ

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কাটোয়া মহকুমার সুপরিচিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রচনা। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাঁকে কখনো থাকতে হ'য়েছে প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনো বা কারান্তরালে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে যে উদার মানসিকতা তিনি অর্জ্জন করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা যেন কতগুলি কবিতায় বিধৃত হ'য়েছিল। 'মানসী' সেই বিচ্ছিন্ন রচনার চয়নিকা। কবিতাগুলিতে শুধু সংগ্রামী কবির মেজাজের পরিচয়ই নেই, বিস্মৃত প্রায় অতীতের সেই সংগ্রাম-মুখর পরিবেশও ধরা দিয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের কাছে 'মানসী'র সার্থকতা সেখানেই।

কাটোয়া,
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৪

শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়
॥ সম্পাদক, সাপ্তাহিক কাটোয়া ॥

Scanned with CamScanner

॥ সূচীপত্র ॥

—:০:—

মানসী

আহ্বান

সান্ধ্য সমীরণ বহিতেছে ধীরে ধীরে,
তখনো বসে আছি স্রোতোস্বতী তীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা দেখিতে দেখিতে
মগ্ন ছিনু অতীতের সাথে।

হেনকালে বাণী যেন শুনি আচম্বিতে—
"এস বৎস স্বরাজের পথে।"
চমকি ফিরিয়া দেখি কলকণ্ঠে ধায় পাখী
নাহিক মানব সেথা—বহে মৃদু বায়
অগ্রে মম কল কল প্রবাহিত নদী জল
পরপারে ডোবে রবি পাহাড়ের গায়।
সহসা দাঁড়ায়ে উঠি ভূমি 'পরে পড়ি লুটি
কহিলাম "মাতঃ ক্ষম মোরে দয়া করি
চিনেছি ভারতরাণী শুনেছি তোমার বাণী
আর নাহি ভুলিব তোমা ক্ষম ক্ষেমঙ্করী।"

মালিহাটী, ১৯২১

Scanned with CamScanner

বেলা যায়

ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে দিন বহে যায় চলে
(হে মানব) কর্ম্মময় এ মহা জগৎ ;
কর্ত্তব্য সাধন তরে আসিয়াছ এ সংসারে ?—
মানবের কর্ত্তব্য বৃহৎ !
তবে আলসে, বিলাসে, কেন কাল যাপ' হেসে
প্রতি ক্ষণ অমূল্য রতন
যে ক্ষণ বিগত হায় ! কেহ কি ফিরিয়া পায় ?
কেন তবে মোহে নিমগন ?
দিবা অবসান প্রায় দিনমণি অস্তে যায়
তবু নাহি হও সচেতন ?
রাত্রি আসে—অন্ধকার পথ চেনা হবে ভার
মোহ পাশ করহ ছেদন ।
বৃথা কি জনম তব ? প'ড়ে রবে কাজ সব ?
বৃথা গেল সারা দিনমান
সে পথে কর গমন মহা জ্ঞানী মহাজন
দিয়াছেন যে পথ-সন্ধান ॥

মালিহাটী, ১৯২১

শুভযাত্রা

উঠ উঠ যাত্রীগণ, উঠ ত্বরা করি
যেতে হবে বহু দূরে
সুদূর সাগর পারে
কেন গো ঘুমাও সবে কর্ত্তব্য পাশরি' ?
গাহিছে কুলায় পাখী ও প্রভাতি গান
এবে প্রভাত হয়েছে
অন্য সকলে জেগেছে
আর কেন ঘুমাইছ উঠ হে ধীমান ।
পূর্ব্ব দিকে উঠে রবি লোহিত বরণ
মোহনিদ্রা ছাড়ি সবে
বাহিরে আসিতে হবে
শয্যা ত্যজি এস আজি যাত্রী অগণন ।
চেয়ে দেখ বিদেশের যাত্রী বহুদল
চলিয়াছে অগ্রে তব
মাতিয়া উৎসাহে নব
মোরা শুধু প'ড়ে রব এতই দুর্ব্বল ?
অদম্য সাহসে বুক বাঁধিয়া সকলে
সন্তরিয়া নদনদী
লঙ্ঘি গিরি অভ্রভেদি
এ শুভ সময়ে যাত্রা কর সবে মিলে ।

মালিহাটী, ১৯২৩

Scanned with CamScanner

আবেগ

কোন্ সাগরের মাঝ হ'তে উঠে ঐ সুমধুর গান
আজি কেন টানে মোর প্রাণ ?
আমার মনের মাঝে একি এ হইল আজি
কেন এ প্রাণের সুর বেসুরে উঠিল বাজি
কাহাতে আমার প্রাণ আজিকে গিয়াছে মজি
পুলকে শিহরে কেন প্রাণ।
প্রাণের পিপাসা মোর হঠাৎ উঠেছে জাগি
হৃদয় খুলিয়া গেছে কাহার পরশ লাগি
পরাণ কাঁদিছে সদা কাহার দরশ মাগি
প্রাণে সদা বাজে কোন্ তান।
আমার হৃদয় বেগ রুধিয়া রাখিতে নারি
নাচে হৃদি অনিবার সে গীত শ্রবণ করি—
মনে হয় ঝাঁপ দিই সে সুর মরমে ধরি
মনে হয় হই আগুয়ান।
কামনা বাসনা ভরা আমার এ ক্ষুদ্র তরি
ডুবে বুঝি যায় আজ অকুল পাথারে পড়ি
এ ঘোর সঙ্কট মাঝে রক্ষা কর ওহে 'হরি'
দিবা যে হয় অবসান।

সালার (খাদি আশ্রম) ১৯২৮

প্রার্থনা

আনিয়া এ রঙ্গভূমে ছাড়িয়া দিয়াছ মাগো
পরীক্ষিতে সন্তানে তোমার,
পড়িয়া এ ঘোর রণে আকুল অন্তর মোর
পরিশ্রান্ত হয়েছি এবার।
পরীক্ষায় হ'য়ে পার তোমার সন্তান সব
অগ্রসরি গিয়াছে চলিয়া,
শুধু একা আমি আজ প'ড়ে আছি পথ মাঝে
দিশাহারা—পথ গেছি ভুলিয়া।
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুগণ অবিরত
বিপথেতে ল'য়ে যেতে চায়,
কামনার চিন্তারাশি উঠে সব মনে ভাসি'
পাপ পথে মন সদা ধায়।
রিপুর তাড়নে আর পারি না সহিতে ভার
ক্ষমা দাও তোমার সন্তানে,
দয়া করি কর পার কোরো না ছলনা আর
বঞ্চিও না তব কৃপাদানে।
জানি না কোথায় পথ কাঁদিতেছি অবিরত
পশে না কি অন্তরে তোমার ?
লহ মাগো লহ কোলে ব্যথা সব যাই ভুলে
কর মোর জ্ঞানের সঞ্চার।

Scanned with CamScanner

হৃদয়ের কালিরাশি ধুয়ে যাক্ মুছে যাক্
পাপ চিন্তা হয়ে যাক্ লীন
অন্তরের কাম ক্রোধ স্তব্ধ হ'য়ে যাক্ আজ
হ'য়ে যাই অনন্তে বিলীন।
অবনত মোর শিরে অন্তিমে পড়ুক ঝ'রে
কণামাত্র করুণা তোমার
পবিত্র আশিসে তব ধন্য হ'য়ে মুক্ত হ'য়ে
বরি সুখে মৃত্যুর দুয়ার।

সালার (খাদি আশ্রম) জানুয়ারী, ১৯২৯

আত্ম সমর্পণ

মায়ের শরণ লয়েছি—
হতাশ হ'য়ে মায়ের পায়ে আমি শরণ লয়েছি।
দিনের শেষে সাঁঝের বেলায় দিনগুলিকে কাটিয়ে হেলায়
ভবপারে যাবার বেলায় পথ ভুলেছি।
ডাক্‌লে কেউ দেয় না সাড়া ওপারেতে গেছে যারা
নদী তীরে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।
নায়ে আজি নেইকো নেয়ে পারের কড়িও নেইকো ঠেঁয়ে
কেমনে পার হব গিয়ে নাহি ভেবেছি।
ভব নদীর তুফান ভারি কেমনে হায় দিব পাড়ি
(মাগো) অকুলে পার কর তরি
তোমায় পরাণ সঁপেছি।

সালার (খাদি আশ্রম) ১৯২৯

পথহারা

বাসনা লালসায় মন ডুবে যায়
তার' মাগো এ ঘোর সঙ্কটে
পারি না রোধিতে বাসনার বেগ
পাপ পথে সদা মন ছোটে।
নররূপে লভি জনম হেথায়
বাসনার দাস হইলাম হায়,
কিসের লাগিয়া আসিনু ধরায়
নাহি আসে তাহা মোর ঘটে।
মানব জনম সকলের সেরা
ভুলিয়াছি তাহা হয়ে জ্ঞানহারা
ছুটিয়াছি হায় পাগলের পারা
শুধু কামনার পশ্চাতে।
পরিণাম এর স্মরি অবশেষে
দুর্ব্বল চিত কাঁপে লাজে ত্রাসে
'মা' 'মা' বলি কাঁদিয়া হতাশে
ছুটিয়াছি ভব নদীতটে।
তাই ডাকি মাগো আসি দেখা দাও
দুর্ব্বল ছেলে কোলে তুলে নাও
বাসনা কামনা ধুয়ে মুছে দাও
ফুটে উঠ মোর হৃদ পটে।

সালার (খাদি আশ্রম) ১৯২৯

Scanned with CamScanner

ভুল ভাঙ্গা

(আমার) ভুলগুলি সব ভাঙ্গিয়া দাও মা
বসিয়া আমার অন্তরে
চক্ষু আমার খুলিয়া দাও গো
প্রকাশি বিশ্ব সত্যেরে।
বসি এতদিন হা হুতাশে দিন
কাটায়েছি সব অবহেলে
নিজেরি মুক্তি লভিবার তরে
ছুটিয়াছি তব কাজ ফেলে।
ভাবিয়া এখন মরমে মরি মা
কাঁদিয়া তোমার চরণে ধরি মা
চক্ষু আমার খুলিয়া দেখাও
সত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম রে।
আমারে যেন বিলায়ে দিই মা
তোমারি বিশ্ব তলে,
নর-নারায়ণ সেবাই ধর্ম্ম
(যেন) নাহি ভুলি কোনো কালে।
সেবার মাঝেতে আপনা হারায়ে
তোমার আশিস শিরেতে ধরিয়ে
পরের লাগিয়া মরিতে শিখাও
ভুলিয়া নিজ মুক্তিরে।

সালার (খাদি আশ্রম) আগষ্ট, ১৯২৯

মুক্তির আহ্বান

কে কোথা আছিস তোরা আয় ছুটে আয় ত্বরা
এসেছে দেশের আহ্বান,
ঐ শোন্ বাজে ভেরী নাই—ওরে নাই দেরী
মহাত্মাজী রণে আগুয়ান।
অহিংস সংগ্রামে আজি চলেছেন গৃহ ত্যজি
হস্তে তাঁর বিজয় নিশান !
জাতির মুক্তির তরে ধরেছেন দৃঢ় করে
অহিংসার শানিত কৃপাণ।
বাজিছে কালের ভেরী কেন মিছে কর দেরী
হও সবে হও আগুয়ান,
নিশ্চয় হইবে জয় কোরো না কোরো না ভয়
পিছনে আছেন ভগবান।
নিরন্তর প্রাণে বাজে পরাধীনতার জ্বালা
সহিবে কতই অপমান ?
ভেঙ্গে কর চুরমার দাসত্বের ও শৃঙ্খল
উড়াও রে বিজয় নিশান।
জাতির মুক্তির যজ্ঞে 'হবি' কে হইবে আজ
দিবে কেবা প্রাণ বলিদান ?
পূজারী ডাকিছে ওই কই কোথা 'হবি' কই
বিলম্ব সহে না হবি আন্।

যে হোমাগ্নি জ্বলিয়াছে সারা ভারতের মাঝে
আসিয়াছে যে মহা আহ্বান,
হবির অভাবে তাহা নিভে নাহি যায় যেন
শুন ওরে হিন্দু মুসলমান।
কর দৃঢ় পণ সবে— জগতে বাঁচিতে হবে
অধিকার লইয়া সমান,
স্বাধীন ভারত পুনঃ করুক প্রমাণ বিশ্বে
মরে নাই ভারত সন্তান।
ভারতের শত শত মোহাচ্ছন্ন নরনারী
মরণের পথে আগুয়ান,
মৃত্যু পথযাত্রী তোরা— ফিরাতে মরণ হ'তে
মহাত্মার মহা অভিযান।
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী সৈনিক কে হবে আজি
কে রাখিবে দেশের সম্মান ?
কে চাহ করিতে মুক্ত পরাধীন ভারতেরে
দাসত্বের করি অবসান ?
নির্ভীক কে আছ আজি চলে এস অগ্রসরি
ছাড় দ্বিধা, ভেদ অভিমান,
জাতির মুক্তির তরে লভিতে দেশের স্বার্থ
ক্ষুদ্র স্বার্থে দাও বলিদান।

সালার (খাদি আশ্রম) ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০

সুপ্ত ভারতের প্রতি

না জানি কেমন ঘুমের নেশায় এখনো সবে রয়েছো ভোর,
জানি না কখন ঘুচিবে গো হায় ভারতের চির সুপ্তি ঘোর।
এখনো কি হায় হয়নি সময় টুটাতে মোহ মদিরা ডোর,
ছিন্ন করিতে অধীনতা পাশ ঘুচাতে মায়ের নয়ন লোর ?
কোরাস্—জাগো জাগো সবে দাঁড়াতে যে হবে
নিজের পায়েতে করিয়া ভর।
স্বাধীন বলিয়া দিতে পরিচয় জগতে মোদের কিসের ডর॥

দেখ দেখ চেয়ে সমুখে তোমার কতই সাধক মহান প্রাণ,
অকাতরে তাঁরা দেছে আত্মবলি রাখিতে নিজের দেশের মান।
কত শত বীর স্বদেশের তরে গাহিয়া অমর মরণ গান,
বরণ করিয়া ফাঁসির মঞ্চ নির্ভয়ে প্রাণ করেছে দান।
কোরাস্—জাগো জাগো সবে······ইত্যাদি।

স্বদেশের চির মুক্তি পিয়াসী লক্ষ লক্ষ সেবকগণ,
চেয়ে দেখ তারা কারামন্দিরে ধ্যান নিমগ্ন—গণিছে ক্ষণ।
সয়েছে কতই অপমান আর খেয়েছে লাঠির কতই মার,
নীরব সাধনা তবুও তাদের ভঙ্গ করিতে পারেনি আর।
কোরাস্—জাগো জাগো সবে······ইত্যাদি।

কিশোর কিশোরী তরুণী তরুণ বালক বালিকা বৃদ্ধ আজ,
চলিয়াছে সবে এ মহা আহবে ফিরাতে পারেনি দম্ভী রাজ।

Scanned with CamScanner

কারাগার আজি হয়েছে তীর্থ, ফাঁসির মঞ্চ স্বরগ রথ,
অপমান আজি হয়েছে ভূষণ, কে রোধিবে আর মুক্তি পথ!
কোরাস্—জাগো জাগো সবে……ইত্যাদি।

ভারতের এই দুর্দ্দিন মাঝে কে তোরা এখনো ঘুমায়ে আজ?
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ওরে ভাঙ্গ মোহঘোর সাজরে আজিকে সমর সাজ
বাজায়ে দামামা চল চল সবে সাধিতে হইবে মায়ের কাজ,
আনিতে হইবে কারাগার হ'তে বীর সেনা দলে দেশের মাঝ
কোরাস্—জাগো জাগো সবে……ইত্যাদি।

জাগ্‌রে আজিকে তরুণের দল, জাগরে ছাত্র, জাগরে বীর
বহে নাকি তোর শিরায় শোণিত হেরিয়া মায়ের অশ্রুনীর?
পুথি পাততাড়ি ফেলে দেরে আজ মুক্তি সমরে ছুটিয়া চল্।
যুগে যুগে আনে দেশের মুক্তি দেশের তরুণ শহীদ দল।
কোরাস্—জাগো জাগো সবে দাঁড়াতে যে হবে
নিজের পায়েতে করিয়া ভ
স্বাধীন বলিয়া দিতে পরিচয় জগতে মোদের কিসের ডর।

সালার (খাদি আশ্রম)
১২ আগষ্ট, ১৯৩০

(কান্দী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের জন্য রচিত)

ধূমকেতু

বঙ্গের গৌরব রবি অস্তমিত হ'ল যবে
পলাসীর কানন অন্তরে,
ছদ্মবেশী বণিকেরা দেখা দিল দস্যুরূপে
যেই দিন পলাসী প্রান্তরে;
'সিরাজের' রাজদণ্ড ভূ-লুণ্ঠিত হ'ল যবে
শঠ 'জাফরের' পদতলে,
হস্তগত করি যবে পরিপূর্ণ কোষাগার
জালিয়াতি ছলনার বলে
বিদেশী বণিকগণ সিংহাসন অধিকারী
নিল হাতে শাসনের ভার,
মোহাচ্ছন্ন বঙ্গবাসী স্বেচ্ছায় বরিল গলে
সুকঠিন শিকলের হার—
সেদিন উদিল বঙ্গে কালরূপী ধূমকেতু
সঙ্গে ভাবী প্রলয়ের ছায়া,
সারা ভারতের মাঝে প্রসারিল ক্রমে ক্রমে
সর্ব্বনাশা শয়তানী কায়া।
তাহার সূচনা মাত্রে 'সিরাজ' 'মীরকাসিম'
নন্দকুমার দিল প্রাণ
মোগলের রাজ্যশশী চিরতরে ডুবে গেল
রসাতলে গেল রে পাঠান।

মারাঠা ও শিখ জাতি— শক্তিশালী ছিল যারা—
শক্তিহীন করিল তাহারে,
কোষাগার পরিপূর্ণ অগণিত ধন রত্ন
চলে গেল সাগরের পারে।
তাহার পুচ্ছের স্পর্শে সোনার ভারতবর্ষ
শ্মশানে হয়েছে পরিণত,
সুজলা সুফলা শ্যামা বঙ্গমাতা আজি হায়
পরাধীনা—পীড়িতা সতত।

* * *

ছুই শত বর্ষ পরে সেই ধূমকেতু আজো
দেখা যায় ভারত গগণে,
চঞ্চল যে ধূমকেতু শুনা যায় ইতিহাসে
অচল সে হয়েছে এখানে।
সর্ব্বনাশা তার ছায়া নাশ করিবার তরে
ভারতের কত সুসন্তান
ঝাঁপায়ে পড়িয়া হায় সমর তরঙ্গে ঘোর
মহাপ্রাণ দেছে বলিদান।
তাহার তরঙ্গাবর্ত্তে 'সত্যেন', 'কানাইলাল'
'ক্ষুদিরাম' বঙ্গের গৌরব
দিয়া নিজ প্রাণ দান রাখিল অমর নাম
চিরস্থায়ী যশের সৌরভ।
বাংলা মায়ের ছেলে 'যতীন' সে অবহেলে
দিল প্রাণ সম্মুখ সমরে,

'দেশবন্ধু' মহাপ্রাণ করিলা মহাপ্রয়ান
শয়তানে পরিহার তরে।
দ্বিতীয় 'যতীনদাস' মৃত্যুরে করিল জয়
ধূমকেতু কারাগার মাঝে,
'পঞ্জাব কেশরী' সহ 'মতিলাল' শ্রান্ত রণে
দেবতার স্বরগে বিরাজে।
ভারতের আরো কত মহাপ্রাণ অগণিত
অমর যে বিশ্ব ইতিহাসে
ধূমকেতু কোপে পড়ি সানন্দে মৃত্যুরে বরি
চলে গেছে পুণ্য স্বরগ বাসে।

* * *

সহসা একি রে হেরি ভারত আকাশ যোড়া
ধূমকেতু সিংহাসনখানি
ম্লান হ'তে ম্লানতর টলমল করে সদা
ছুটিয়া গিয়াছে শয়তানী।
তু' শত বছর ধরে যে শিকড় ধূমকেতু
গেড়েছিল ভারতের বুকে,
সন্ধান পাইয়া তার জাগ্রত ভারতবাসী
উপারিয়া ফেলিয়াছে সুখে।
অগণিত মহাপ্রাণ শহীদের আত্মদানে
লভিয়া কি শকতি মহান
নবীন ভারত আজি ছুটিয়াছে আত্মহারা
পাইয়াছে পথের সন্ধান।

Scanned with CamScanner

মূর্ত্তিমান শয়তান হে বিরাট ধূমকেতু
আর তোমা ভয় নাহি করি
দেশের উপর তব প্রবল প্রভাব কাল
চলিয়া গিয়াছে অপসরি।
যুগে যুগে যেই শক্তি নেমে আসে ধরাতলে
নিবারিতে শয়তানী লীলা
সেই শক্তি সঞ্চারিত আজি ভারতের বুকে
সাঙ্গ এবে তব লীলা খেলা।
পরিপূর্ণ কাল তব আর কোনো শক্তি নাই
মহাশক্তি করে নিবারণ
লাঙ্গুল গুটায়ে এবে হে পশ্চিমা ধূমকেতু
ত্যজ আজি ভারত গগণ।

সালার (খাদি আশ্রম) ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ভিক্ষার গান

[বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে রচিত]

ভিক্ষা দাও গো গ্রামবাসী এসেছি ভিখারী সাজিয়া,
বাঙ্গলার দুখী ভাই-বোন তরে—মরিছে যাহারা ডুবিয়া।
ভীষণ বন্যায় ডুবায়েছে দেশ
যা ছিল সম্বল হয়েছে নিঃশেষ
খাদ্যদ্রব্য সহ ঘরবাড়ী সব গিয়াছে সকলি ভাসিয়া॥
(সেথা) কাঁদিছে জননী শিশু কোলে ক'রে
কাঁদিছে বালক মার হাত ধরে
অনাহারে কত বালক বালিকা নীরবে যেতেছে মরিয়া॥
দাও দাও ভাই যাহা লয় মনে
বাঁচাইতে এই দীন ভাই বোনে—
আসিয়াছি মোরা দুয়ারেতে তব অঞ্চলখানি পাতিয়া॥
এসো গো জননী অন্ন থালা হাতে
বাঁচাও সন্তানে এ ঘোর সঙ্কটে
সন্তানের দুখে তোরা না কাঁদিলে
কেহ না রহিবে বাঁচিয়া॥

মাসুন্দী, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৩৮

Scanned with CamScanner

সুদূরের যাত্রী

কে তুমি হে রথারোহী
চলিয়াছ তুমি বিজয় গর্ব্বে দুর্গম পথ বাহী !
রথ শিরে উড়ে বিজয় কেতন
দুন্দুভি তব বাজে ঘনে ঘন
শঙ্খ তোমার করিছে ঘোষণা কাহার আগমনী !
পরাধীন প্রাণে পুনঃ জাগাইলে আশার চেতনাবাণী ॥
ওগো তোমার মুখের বাণী
ডাক দিয়ে গেল বিশ্ব মানবে—"শুনহ সকল প্রাণী—
মানুষের মত প্রাণে বাঁচিবার
সকলেরি ভবে আছে অধিকার,
দীনতা ভীরুতা দূরে ফেলে দিয়ে বুক ঠুকে তোরা দাঁড়া।
চির অধিকার বুঝে নেরে তোরা নতশির করি খাড়া ॥"
শুনিয়া সে আহ্বান !
পরাধীন জাতি,—মরে গেছি ব'লে করেছিল যারা জ্ঞান—
জাগিয়া তাহারা মহা কলরবে
রথ লক্ষ্য করি ছুটে গেল সবে—
ফিরে আসে পুনঃ নব উৎসাহে তোমারি আশিস লভিয়া
নব উদ্যমে নূতন জীবন লইল তাহারা গড়িয়া ॥
—ভারতের নরনারী—
শুনেছিনু মোরা তন্দ্রার ঘোরে তোমার বিজয় ভেরী।
স্বপ্ন বলিয়া ভেবেছিনু মনে
সুপ্তির ঘোর ছিল দুনয়নে,

প্রভাত আলোকে মেলিয়া নয়ন হেরিনু যখন দূরে
নব জীবনের আস্বাদে মাতি বিশ্ববাসীরা ফিরে ॥
আমরা শুধুই কিরে !
রহিব পড়িয়া বিশ্বের মাঝে একাকী আনত শিরে ?
তোমার পতাকা নাহি হেরি আর
জয়যাত্রা পথ চিনি না তোমার,
(শুধু) মহান্ বাণীর ঝঙ্কার এক হৃদয় পরতে বাজে,
পশেছিল যাহা ঘুমের আবেশে শ্রবণ-বিবর মাঝে ॥
তাই যে পাগল পারা
ছুটিয়াছি মোরা তব উদ্দেশ্যে হইয়া আত্মহারা !
ছুটিয়া চলেছি অজানিত পথে
নাহি জানি পিছে কেবা আসে সাথে
দুর্গম পথবিঘ্ন আজিকে বাজিছে সদাই বক্ষে,
জেগেছি আমরা—আজিকে মোদের নিদ নাই আর চক্ষে ॥
ওগো সুদূরের পান্থ !
ব্যবধান তব যত হোক্—আজি হই না যতই ক্লান্ত;
পথ কণ্টকে দলি' পদতলে
ঘন কুহেলিকা ভেদিয়া সকলে
লভি' আস্বাদ তব পরশের হইব সকলে ধন্য,
অধীনতা পাশ ভাঙ্গিব আমরা ঘুচাব ভারত দৈন্য।
তার পরে—পথ শ্রান্ত,
নব জীবনের পরশ লভিয়া হইব সকলে শান্ত ॥

———

(দমদম এডিসন্যাল স্পেশাল জেল) ২০শে নভেম্বর, ১৯৩২

কারাগার

জেলখানা নয় তীর্থক্ষেত্র
শিক্ষা-আগার এ কারার ভূমি,
দেশ-মায়ে সেবি আসিয়াছি মোরা
হে বিরাট কারা তোমারে নমি।
তোমারি কঠিন বিশাল বক্ষে
ভারতের কত ভক্ত বীর,
করেছে সাধনা স্বাধীনতা তরে
কত মহাপ্রাণ দিয়াছে শির।
তোমার বক্ষ পবিত্র হোলো
সাধকের দেহ ধরিয়া অঙ্গে,
তাহাদের স্মৃতি রহিয়াছে মাখা
তোমারি ধূলার কণার সঙ্গে।
ভারতের মাঝে যত বীরগণ
চেয়েছে সাধিতে স্বদেশ মুক্তি,
চেয়েছে যাহারা করিতে ধ্বংস
স্বেচ্ছাচারী ওই শাসক শক্তি;
সেই শাসকের সৃজিত হে কারা
তোমারে তারাই করেছে বরণ,
নির্ম্মম তব কঠোর বক্ষে
শৃঙ্খলিত হ'ল তাদের চরণ।

তব ক্রোড়ে বসি কাটায়েছে কাল
গণিয়া গণিয়া দিবস মাস
বছরের পর বছর কাটায়ে
ফেলেছে তাহারা দীরঘ শ্বাস।
তিলে তিলে তারা সঁপেছে পরাণ
নির্জ্জন কারা কক্ষ মাঝে
দেশের লাগিয়া দুঃসহ ব্যথা
অবহেলে তারা সয়েছে যে!
তোমার বক্ষে ফাঁসির মঞ্চে
ভারতের কত শহীদ বীর
লভেছে আরাম—স্বাধীনতা তরে
অর্পিয়া প্রাণ—হয়েছে স্থির।
জীবনে তাহারা পায়নি শান্তি
পরাধীনতার বেদনা বহিয়া,
তাই চেয়েছিল এ কলঙ্করেখা
মুছাতে বক্ষ শোণিত ঢালিয়া।
লভেছে তাহারা চির বিশ্রাম
তোমারি কঠিন ক্রোড়ের 'পরে,
বাসনা তাদের আজো অতৃপ্ত
বদ্ধ কারায় ভ্রমিয়া ফিরে
কহিছে সবারে—"শুন দেশবাসী
চাই ভারতের মুক্তি চাই,
তৃপ্ত হইবে আত্মা মোদের
ভারত মুক্তি লভিলে ভাই…"

Scanned with CamScanner

তাদের প্রাণের এ আকুল কথা
বদ্ধ কারারও গণ্ডি ভেদি,
পশিয়াছে আজি সারা ভারতের
নরনারী প্রাণে মর্ম্ম ছেদি'।
তারি সনে মিশি রহিয়াছে হেথা
নিপীড়িত মহাপ্রাণের বাণী,
ভগ্ন স্বাস্থ্যে ফিরেছে যাহারা
বন্দীশালায় রক্তদানি।
শত শত বীর যুবকে গ্রাসিয়া
রাক্ষসি তোর মেটেনি ক্ষুধা,
তাই চাহিতেছ এখনো শোষিতে
ভারতবাসীর রক্ত সুধা !
আজি আসিয়াছি মোরা লক্ষ শত
করিবারে তব ক্ষুধার শেষ,
তিলে তিলে দিয়া বুকের শোণিত
স্বাধীন করিব মোদের দেশ।

(দমদম এডিসন্যাল স্পেশাল জেল, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩২)

মাতৃহারা

(জলপাইগুড়ি নিবাসী সোদরোপম শ্রীমান নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মাতৃবিয়োগ জনিত দুঃখপূর্ণ পত্রের উত্তরে)

প্রাণের ভাইটি লিপিকা তোমার জানাইল সমাচার—
"এ দুনিয়া ছাড়ি মাতা আজি মোর গিয়াছেন পরপার।
হৃদয় আমার হয়েছে শূন্য কিছুই লাগে না ভালো,
সমুখে আমার সবই আঁধার কোথায় পাইব আলো !
বিদায়ের বাঁশী আজিকে আমারে বধির কোরেছে হায়
মনে হয় যেন সারা দুনিয়াটা আমারে ছাড়িয়া যায়······"
নাই ওরে নাই সান্ত্বনা বাণী মোর এ শুষ্ক বুকে,
মায়েরে হারানো কি যে দুখ—বুঝি তাই ভাষা নাই মুখে।
আজিকে তোমারে সান্ত্বনা দিতে আমি নাহি নাহি চাই,
মার কোল চেয়ে শান্তির ঠাঁই ধরার মাঝে যে নাই !
শুধু দুটো কথা ভাইটি আমার মন দিয়ে তুমি শোনো।
ভব-রূপ এই অতিথিশালায় স্থায়ী নয় জীব কোনো
আসার মতই যাওয়াও সত্যি এ প্রথা চিরন্তনী
কাজ শেষ হ'লে সকলেই যাবে বিধির বিধান মানি।
ওই দেখ চেয়ে সম্মুখে তব সাগ্রহ বুক পাতা
—মাতৃহারারে কোলে ঠাঁই দিতে—জননী জগন্মাতা
প্রসারি বক্ষ—করুণার ছবি—কহিছেন মৃদু বোলে—
"আয় ওরে তাপী মাতৃহারারা জুড়াবি আমার কোলে।"
তাঁর 'পরে মন কর সমর্পণ প্রাণের ভাইটি মোর
জ্বালা দূরে যাবে, শান্তির বায়ে প্রাণ হ'য়ে যাবে ভোর।

Scanned with CamScanner

বিশ্বের মাঝে অগণিত ওই মাতৃ মুরতি মাঝে;
দেশমাতারূপে জগন্মাতায় সেই মাতা তব রাজে।
এই মার সেবা-ব্রত হৃদে লও শূন্যতা যাবে দূরে,
নর নারায়ণ সেবার মাঝারে পুনঃ মায়ে পাবে ফিরে।
দুনিয়ার হাটে আনিয়া মানবে সত্যের পথে নিতে,
যাচাই করেন কষ্টি পাথরে যেই বিধি বিধিমতে ;
এও তাঁরি এক মহান পরখ জেনো ভাই তোমা 'পরে,
মানবরূপিণী মায়েরে তোমার তাই নিয়েছেন কেড়ে।
মঙ্গলময়ী মায়ের চরণে আজি এই নিবেদন—
শান্তি আসুক জীবনে তোমার শান্ত হউক মন।

(দমদম স্পেশাল জেল, ৩।৪।৩৩ ইং)

ব্যজনী

নিদাঘের খরতাপে তাপদগ্ধ হিয়া যবে,
তোমার স্মরণ লয় প্রিয়া চেয়ে প্রিয় ভেবে।
তোমার পরশে যবে পরিতৃপ্ত হয় হিয়া—
হাসিমুখে তোমা ছেড়ে খুজে নর—কোথা প্রিয়া।

আলোছায়া

আমার পাশে হাসপাতালে
আছে একটি দুষ্টু ছেলে।
নামটি তাহার দিবাকর
সদাই নাচে খাটের 'পর।
দুষ্টামী তার বেজায় ভারী
তার জুলুমে পড়তে নারি।
রাগ ক'রে তায় বকি যদি,
হাসতেই থাকে নিরবধি।
জুলুম ক'রে ঘাড়ের 'পর
চড়বে, না হয় মারবে চড়।
এতেও যদি রাগাতে নারে
টান্‌বে আমার চৌকিটারে।
সত্যিই যখন উঠি রেগে
দুষ্টু হেসে পলায় বেগে।
জব্দ শুধু ধরলে মাথা,
দুষ্টামী তার পলায় কোথা!
ডাকে তখন উচ্চৈঃস্বরে—
" 'দাদা' 'দাদা' ধর না মোরে!
মাথাটা আমার যায় যে খ'সে
ধর', না আমার পাশে ব'সে!
ওই যে আগুন—যাব কোথা!
গরম হয়ে উঠছে মাথা—
ডাক্তার বাবু?—বাঁচি না যে!
ওষুধ খাব?—মুখটি বুজে
থাকতে যে আর পারছি না,
বাড়ছে কেবল যন্ত্রণা—
ঘুম আসে যে—পালিয়োনাকো
আমার পাশেই ব'সে থাকো।
লক্ষ্মী দাদা তুমি আমার
দুষ্টামী ত' করব না আর—"
এম্‌নি ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে
হাসপাতালে খাটের 'পরে।
আমি তখন চেয়েই থাকি
সরল মুখের ভাবটি দেখি।
চৈত দুপুরের গরম বায়ে
হাসপাতালের পরাণ দহে।

(দমদম স্পেশাল জেল হাসপাতাল, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩)

বর্ষ-বিদায়

বর্ষ শেষের গভীর রাতে, এ আবার কোন্ রূপ দেখালে ওগো!
কোন অসুরে হান্‌তে আজি, ভয়ঙ্করের মূর্ত্তি নিয়ে জাগো!
চৈত্র শেষের চাঁদনী রাতে, ঘুমিয়েছিল সারা বিশ্বখানি;
বসন্ত তার বিদায় ব্যথা জানাচ্ছিল মলয় সমীর দানি।
তার বিদায়ে মৌন দুখে আকাশে চাঁদ হাসছিল ম্লান হাসি
প্রকৃতি-রাণী নীরব, শুধু বিদায় ব্যাপার দেখতেছিল বসি।
হঠাৎ একি! বজ্রনাদে বিশ্বটা যে উঠল চকিত হ'য়ে।
শান্ত নীরব মূর্ত্তি ছাড়ি, প্রকাশ হ'লে এ কোন্ মূর্ত্তি নিয়ে!
প্রলয় রূপের অন্ধকারের মূর্ত্তি তব রুদ্র ভীষণ দাপে,
ক্ষণে ক্ষণে রোষের আগুন ঝিলিক মারে বিশ্ব পরাণ কাঁপে।
মহাকালের ঘুম ভাঙ্গা'ল, রোষ জাগা'ল কোন্ সে ভয়ঙ্কর?
গগণভেদী হুঙ্কারে তাই প্রলয় নাচন নাচেন দিগম্বর!
বিশ্বভরা অত্যাচারে, বিশ্ববাসী নয়ন মুদে ডাকে,
সে ডাক আজি পৌঁছাল কি রুদ্রদেবের যোগ নিদ্রার ফাঁকে!
শত যুগের পুঞ্জীভূত নর-দানবের জমাট অত্যাচার
মহাযোগীর যোগ ভাঙ্গাল'; অত্যাচারের নাইক রে নিস্তার!
নাগের দলও উঠল ক্ষেপে, জটাধারীর জটার আড়াল হ'তে;
কৃপাণ সম বিষের ফণা ঢেউ তুলেছে আকাশ ছায়াপথে।
সে গরলের তরল ধারা আসছে নেমে প্রবল বারি স্রোতে!
ত্রিলোক-নাশা রোষের আগুণ উঠল জ্বলে কালের কপালেতে
চারিদিকেই ধ্বংস লীলা, মহাকালের নৃত্য সে তাণ্ডব,
বজ্রনাদে দানব কাঁপে,—সবহারারা পায় যে মাভৈঃ রব।

উল্লাসে তাই প্রলয় রাতেও, সবহারাদল ভয় করে না আর,
মুগ্ধ হ'য়ে রুদ্র রূপে আহ্বানে, আর নমে বারংবার।
'আজ বরষের শেষের রাতে, পুরাতনের সঞ্চিত সব পাপ
দূর করিতে এসেছে আজ, মহাদেবের রুদ্র অনল তাপ।
সেই অনলে বর্ষ সাথে হউক আজি সব অশিবের ক্ষয়
নিশীথ রাতের প্রলয় গানে উঠুক বাজি' নবীন যুগের জয়।

(দমদম স্পেশাল জেল হাসপাতাল, চৈত্র সংক্রান্তি ১৩৩৯)

নব বর্ষ

বছরের নব প্রাতে, নবীন ঊষার সাথে হে আলোকময়!
সৌম্য শান্ত অভিনব, জ্যোতির্ম্ময় রূপ তব হ'ল অভ্যুদয়।
যত কিছু ভাল মন্দ, যত সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব রাখি দূরে,
অন্তরের আবাহনে, বন্দে আজ তোমা গানে বন্দী নত শিরে।
পুরাতন যত পাপ, যত কিছু অভিশাপ শপ্ত দুনিয়ার—
আজি আর কিছু নাই, হয়ে গেছে সব ছাই সব চুরমার।
বর্ষ শেষ যামিনীতে, রুদ্র-রূপ বারিপাতে সব মুছে নিয়ে,
বিশ্বের কালিমা যত—যুগ যুগ সঞ্চিত, সব দে'ছ ধুয়ে।
নবীন প্রভাতে আজি, মঙ্গলের রূপে সাজি দেখা দিলে তুমি,
পূরব আকাশ ভালে, স্নাত রাঙ্গা চক্রবালে প্রেম ভরে চুমি।
আজি নব বর্ষ দিনে, বিশ্বজন কায়মনে করে নিবেদন—
হে রাজা! প্রভাব তব, সৃজুক এ বিশ্ব নব করিয়া নূতন।

এতদিন গর্ব্ব ভরে নব পৃথিবীতে নরে ফেলিয়া চরণে,
আভিজাত্য মদে মাতি, ঘৃণা করিয়াছে নিতি নর নারায়ণে।
এ বিপুল ধরা বুকে সবে রবে সম সুখে নীতি-চিরন্তন
যেমনি সম্ভোগ করে সমভাবে সর্ব্ব নরে তোমার কিরণ।
ভুলিয়া এ নীতি হায়, নর কেড়ে নিতে চায় পর অধিকার,
ভেঙ্গে দাও এই নেশা 'মানুষ-পেষণ-পেশা' এই দুনিয়ার।
তোমার প্রেমের ধরা, দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা ভরা দেখ না কি তুমি
আজি ন্যায় দণ্ড হাতে অন্যায়েরে বিনাশিতে মর্ত্তে এস নামি
তোমার পরশে ধরা, পেয়ে নব শক্তিধারা হোক্ মহীয়ান,
মৈত্রী সাম্য সাম গানে পূর্ণ করি এ ভুবনে কর অভিযান।

———

(দমদম স্পেশাল জেল হাসপাতাল, ১লা বৈশাখ, ১৩৪০)

মহা প্রায়শ্চিত্য

ভারত গগণে তরুণ তপন অমা'র বক্ষ চিরে
তমসা নাশিয়া দিবা প্রকাশিয়া উদিত হইল ধীরে।
নব ভারতের মহামানবের ব্রত শেষ হোলো কি রে ?
দেশের ভক্ত সত্য সাধকে পাইনু কি পুনঃ ফিরে ?
সত্য যুগের শত শত নর—শুনিয়াছি মোরা কানে—
সুকঠোর তপ করিয়া সাধন দেবতারে টেনে আনে।
শুনেছি,তাহারা করিয়াছে তপ নিজের মুক্তি লাগি'
অমর হইতে, ধন যশ পেতে লইয়াছে, বর মাগি'।

কেহ বা করেছে তপস্যা কঠোর পুত্র কলত্র চাহি,
রাজ্যলাভ তরে অনাহারে কেহ নানাবিধ ক্লেশ সহি ;
শত্রুর বিনাশ কেহ বা চাহিল তপে তুষি দেবতারে,
স্বার্থশূন্য ইহাদের মাঝে দেখিনাত কোনোটারে।
কামনা শূন্য পরহিত ব্রতে, সত্য সাধন ব্রতে
চিত্ত শুদ্ধি করিতে চাহিল সুকঠিন তপ পথে।
অনাহার ব্রত গ্রহণ করিল চমকিল বিশ্বজন,
বারণ করিল কোটী কোটী নর তবু টলিল না মন।
আজি হোলো শেষ সে কঠিন ব্রত, গাহ সবে ঢালি প্রাণ,
গাহ গাহ আজি জগতপূজ্য গান্ধীজী জয় গান।

* * *

ঘরের ভেতরে কেতাবে মগ্ন কে তুমি সন্দিহান ?
পুঁথির ভেতরে মুক্তি খুজিছ রোধ করি দুই কান !
দধিচি মুনির দেহ দান—সে ত পুরাণের ইতিকথা,
চোখের সমুখে দেখে যারে তোরা মহা জীবনের গাঁথা।
যুগে যুগে নর নরের উপরে করিয়া অত্যাচার
জমাট করেছে কলুষের রাশি—মহা পাতকের ভার।
অস্পৃশ্য বলি নিজের ভায়েরে সরায়ে রাখিয়া দূরে,
সঞ্চয়িল যেই মহাপাপ রাশি প্রাণের গোপন পুরে ;
মানব জাতির এই মহাপাপ প্রায়শ্চিত্যের তরে,
নিজ প্রাণবলি পণ সে করিল সবিষাদ অন্তরে।
জগতের মাঝে সর্ব্বভূতে রাজে সেই এক ভগবান,
হেন নারায়ণে যেই জন করে অবিচার—অপমান,

Scanned with CamScanner

সেও যে আমারি অংশ সত্য জানি ইহা বিধিমতে
স্বেচ্ছায় যোগী তাহাদের পাপ লয় নিজ বুক পেতে।
জলধি-মথন-উত্থিত-বিষ যেমনি ধরিল গলে
রাখিতে ধরারে মহাযোগী শিব—পান করি হলাহলে,
তেমনি আজিকে ভারতের মাঝে শত শতাব্দী পরে,
আপন জাতির কলুষের ভার লইয়া বক্ষ 'পরে
সাধিলেন যোগী সুকঠিন ব্রত জীবন মরণ রণে,
পুলকে মাতিল বিশ্ব আজিকে গান্ধিজী জয়গানে।

(দমদম স্পেশাল জেল) ২৮শে মে, ১৯৩৩

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা

(মেদিনীপুরের শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি স্মরণে)

শীতের রাত্রি, হয়নি প্রভাত সুষুপ্ত সারা দেশ
কারামাঝে ঐ বেজে উঠে কেন পূরবীর সুর রেশ ?
আজি কি কাহারো মুক্তি দিবস ? হোলো কি মেয়াদ সারা ?
ভোরে উঠি' তাই করে আয়োজন ছাড়িয়া যাইতে কারা ?
"ওরা" কেন তবে করে ছুটাছুটি ? তাড়াহুড়া কেন এত ?
কোনো বন্দীরে মুক্তি দানিতে "ওরা" কেউ আসে না ত !
এ কি ! কোথা হ'তে বাজিয়া উঠিল শিকলের ঝঞ্চনা ?
কেবা আসে ঐ পাহারা বেষ্টিত আছে কি কাহারো জানা ?
সদ্যস্নাত শুভ্র তনিমা, দীপ্তি শোভিছে ভালে,
উন্নত শির, শান্ত দৃষ্টি, চরণে শিকল দোলে !

মুখে মৃদু হাসি, সুগভীর নাদে কহে বন্দেমাতরম্
প্রতিধ্বনী তার নীরব নিশার বুকে তোলে ক্রন্দন !
রাজ অনুচর চলে সাথে সাথে ; তবে কি তাহারে আজ
বিচারের আশে পাঠাবে কোথাও সুদূর সহর মাঝ ?
এত ভোরে তাই করে আয়োজন ?—না-না-তা-ত নয় নয়,
বধ্যমঞ্চের অদূরে যুবক দাঁড়াইল নির্ভয় !
কি ব্যাপার এ কি ! অপরাধী ! ইনি দিবে কি ইহার ফাঁসি ?
তবে কেন হায় দেখা যায় ওই যুবকের মৃদু হাসি !
প্রশান্ত চোখে চাহিয়া যুবক বারেক আকাশপানে—
রহিল ক্ষণেক মুদিয়া নয়ন সুগভীর আত্মধ্যানে।
তারপরে ধীরে মেলিয়া নয়ন, অনুচরে ডাকি কহে ;—
সময় হয়েছে ? আমি প্রস্তুত, বিলম্ব আর না সহে।"
নির্ভয়ে আসি দাঁড়াইল হাসি ফাঁসির মঞ্চ 'পরে
রাজ অনুচর আনতদৃষ্টে ঘাতকে ইসারা করে।—

* * *

ভোরের আলোকে বাজিয়া উঠিল পূরবীর সুর রেশ !
মহান্ একটি জীবন নাট্যের যবনিকা হোলো শেষ !
কারাপ্রান্তরে ফাঁসির মঞ্চে গাহিয়া বিজয় গান,
স্থির হয়ে বীর সঁপিল পরাণ, কাঁপিল না তনুখান !!

* * *

"রাজ অনুচরে করেছিল খুন, দুনিয়ার মহা ভয় !
তাই যে তাহারে সরাইতে হবে"—শাসকের নীতি কয় !
এত ঠিক কথা ! মানি, সে ত' বটে দুনিয়ার মহাভয়,
পরম দয়াল অতি সজ্জন সাধু তুমি অতিশয় !

জুয়াচুরি আর প্রতারণা বলে লভিয়া দেশের মাটি,
আজ সাজিয়াছ অতি সজ্জন ! সাধু হইয়াছ খাঁটি !
জোঁকের মতন রক্ত শুষিয়া ভারতে করিয়া নিঃস্ব ;
পরেছ যতনে ধর্ম্ম মুখোস সেজেছ সাধুর শিষ্য !
সারা ভারতের বক্ষে বসিয়া করেছ তাথৈ নৃত্য,
বুক চিঁরে তার খুন শুষে নিয়ে সাজায়েছ তারে ভৃত্য !
নিজ দেশে আজ পরবাসী যারা—তা'রা দুনিয়ার ত্রাস !
ভারতে দানিবে অভয় তোমরা কাড়ি' ল'য়ে মুখগ্রাস !

* * *

আজ মনে পড়ে সে দিনের কথা, যেদিন ভারতে আসি—
মাগিলে ভিক্ষা রাজ দরবারে ভূমে জানু পাতি' বসি'
বণিকের বেশে। তারপরে শেষে—ছলনা সহায় করি'
অতি হেয় নীচ ঘৃণ্য উপায়ে লইলে এদেশ হরি'।
খুন, জালিয়াতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দিয়েছ কোনটা বাদ ?
ভারতের বুকে শিকড় গাড়িতে ঘটায়েছ পরমাদ।
সেদিন তোমার নীতির দোহাই কোথায় ছিল যে পড়ে
কোথা ছিল তব শান্তির বুলি কেউ জানিত না ওরে— !
আজিও সেদিন ভারতের বুকে সেই সে "জালিয়ানাবাগে,
বালক বৃদ্ধ যুবক নারীর রক্ত বহালে বেগে !
সে রক্তধারা মোছেনি এখনো রঞ্জিত দেশ বুক
শান্তির বাণী ছিল কি সেথায় ? নীতি ছিল কতটুক্ ?
মার বুক হ'তে ছেলে কেড়ে নিয়ে খুন করিয়াছ তারে—
পশু উল্লাসে সতীনারী দেহ কলুষেছ বারেবারে।
ছিল কি তথায় নীতির বাঁধন ? ছিল কি শান্তি তথা ?
রক্ত আঁখরে লেখা আছে বুকে, ভুলি নাই সেই কথা !

না পারি ভুলিতে সে ব্যথার জ্বালা, হয় ত ক্ষণিক মোহে ;
বসায়েছে চুরি অত্যাচারী কোনো রাজপুরুষের দেহে !
হয়ত তাহার ধমনি মাঝারে ছিল রক্তের স্রোত ;—
তাই পারেনিক মার অপমান নীরবে করিতে রোধ !
সেই অপরাধে অপরাধী ইনি খুনী এ যে দাগাবাজ !
ভারতের বুক রক্তে রাঙায়ে তুমি আজ মহারাজ !
বিচার আসনে বসেছে যখন, এমন সাধুটি খাসা—
সেথায় পাইবে সুবিচার ?—সে ত' এমন করেনি আশা !

* * *

যাও হে পূজারী মাতৃ সেবক যাও তুমি সেই ঠাঁই
রাজার আসনে যেথা এইরূপ জুয়ারী ভণ্ড নাই !
আত্মা তোমার লভিবে শান্তি—সেইদিন—সেইক্ষণে,
স্বাধীনতা লভি' দাঁড়াবে ভারত যেইদিন এ ভুবনে।

———

(দমদম স্পেশাল জেল, ১১ জানুয়ারী, ১৯৩৩)

("ওরা" — জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেল : ডাক্তার, দায়রা জজ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

স্বদেশপ্রীতি

[ইংরাজ কবি "স্কট"এর অমর কবিতা "Love of Country"এর মর্ম্মানুবাদ]

এ মর জগতে মূঢ় আছে কোন জন ?
মাতৃভূমি নাম যেবা করে না স্মরণ।
বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিবার কালে ;
যার মন নাহি ভাসে আনন্দ সলিলে ;
কহে না যে—"এই মোর প্রিয় জন্মভূমি"
আছে কি এমন কেহ, চেন নাকি তুমি ?
এরূপ যে কেহ থাকে তারে চিনে রাখ ;
তাহারে সম্মান তুমি কভু দিও নাক'।
যতই থাকুক তার নামের গরিমা,
ধনের প্রাচুর্য্য আর পদের মহিমা,
হতভাগ্য সেইজন এ মহীমণ্ডলে ;—
পদ, নাম, ধন, মান, সবে কুতুহলে
তাহারে ডুবায়ে রাখে অনন্ত নরকে ;
চিরদিন ঘুরে মরে কর্ম্মের বিপাকে।
জীবন বঞ্চিত করে তারে খ্যাতি হ'তে
সেই ভীরু বার বার মরে এ মরতে।
অপবিত্র ধূলি হ'তে পাপ দেহ পায়
পুনঃ সেই ধূলি মাঝে আপনা মিলায়।
মরণের পরে তার সমাধি উপরে—
সম্মান ফুলহার কেহ দিবে নারে !
তার শোকে অশ্রুজল কেহ না ফেলিবে,
অভাগার স্মৃতি-গাথা কেহ না গাহিবে।

———

(বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট জেল, ১৯৩৪)

আগমনী

আগমনীর বাজনা বাজে, চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
শক্তিময়ী মা যে মোদের, আমরা কেন শক্তিহারা ?
শষ্য-শ্যামল বঙ্গভূমি কোন্ পাতকে বল মা তারা ?
যাদুকরের কোন্ সে মায়ায় আজকে মোরা খাদ্যহারা ?

দেশের বুকে করাল ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে মড়ক আসে ;
মায়ের কোলে মরছে ছেলে, কাঁদছি বসে দীর্ঘশ্বাসে !
মৃত্যু আসে ! মৃত্যু আসে ! ধ্বংস আসে সৃষ্টিনাশে !
কালের বুকে কালীর নাচন তাথৈ নাচে অট্টহাসে !

মুক্তি কোথা ? শান্তি কোথা ? প্রলয় মাঝে খুজছি বৃথা—
হতাশ্বাসের আঁধার কালোয় আলোর রেখা নাইরে হেথা ;
মরণ রাগের রাগিণীর ওই সুর যে আজি ছন্দহারা !
সানাই কাঁদে উদাস সুরে প্রাণের মাঝে নাইরে সাড়া।

আগমনীর সুর রাগিণী ব্যথার মাঝে হারায় দিশি ;
দুঃখ পেতে আসবি কি মা ভাবছি বসে দিবানিশি।
অন্নহারা, বস্ত্রহারা, রিক্ত মোরা তন্দ্রাহারা—
কি দিয়ে মা পূজবো তোরে আজ যে মোরা সর্ব্বহারা !

এলি যদি সর্ব্বনাশী ! সর্ব্বনাশের মূর্ত্তি ধরে,
বুভুক্ষের এই চোখের জলের পাদ্য দিয়ে পূজব তোরে।

Scanned with CamScanner

দুঃখ পুষ্প অর্ঘ মা তোর, শূন্য যে নৈবিদ্য থালা !
এ চারিদিন না খেয়ে মা, দেখ্ না কত ক্ষুধার জ্বালা !

* * *

মর্ত্তধামের দুঃখী ছেলের দুঃখ দেখে কাঁদ্‌লি মা কি !
সইতে তো তুই পারলি না গো ভাগ্যদেবের চরম ফাঁকি !
দু'হাতে তাই নয়ন ঢেকে বিদায় নিলি ওমা তারা !
রিক্ত মনের মর্ম্ম ছিঁড়ে আমরা কাঁদি সর্ব্বহারা।

(বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট জেল : বিজয়া দশমী. ১৩৫০)

বিদায়বেলায়

বিদায় বেলায় হে মোর প্রিয়
গাইবে কি আর গান !
তোমার স্মৃতি থাকবে গানেই
সেই ত তোমার দান।

(দমদম স্পেশাল জেল হাসপাতাল : ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৩)

গুণেন্দ্র বিয়োগে

এই দুনিয়ার খেলা সাঙ্গ করি গাহিয়া বিদায় গান
ভাইটি আমার অতি অসময়ে করিলে মহাপ্রয়াণ !
দুনিয়ার মাঝে আসিয়া ধরিলে যেথায় যতই কাজ
সবই অসমাপ্ত রয়েছে এখনো কে তাহা করিবে আজ ?
দেশ-মাতৃকার আহ্বান-বাণী প্রচারিল যবে বঙ্গে ;
তুমি ত তখনি দিয়েছিলে সাড়া সকল প্রাণের সঙ্গে !
পল্লী মায়ের দুঃখ ঘোচাতে নিয়েছিলে সেবা ভার।
পল্লীর তরে সকল কষ্ট সহিয়াছ অনিবার।
এখনো ত ভাই ঘুচেনি দুঃখ মাগিতেছে তোমা সবে
পল্লী জননী আজিও দুঃখিনী তোমাহারা কেন তবে ?

* * *

পল্লী জননী ! কাঁদো অভাগিনী ! কাঁদো আজি উচ্চঃস্বরে
সুপুত্র তোমার গুণেন্দ্রকুমার আর না আসিবে ঘরে।
তোমারই দুঃখ হেরিয়া যাদের নয়নে বহিত লোর,
নাই আর সেই "বীরেন" "গুণেন" বীর পুত্রদ্বয় তোর।
কয়দিন আগে তোমারে কাঁদায়ে 'বীরেন' গিয়াছে চ'লে,
সেই আঁখিজল না শুকাতে হায় গুণেন্দ্রেও হারাইলে।
তোমার মাটির বুকেতে বসিয়া কতদিন সন্ধ্যাকালে,
গড়িত ভাঙ্গিত কতই প্রদীপ আশা নিরাশার জালে।
যারে বুকে পেয়ে তুমি ওগো মাতা ! কত আশা করেছিলে
নিদারুণ বিধি সে আশায় ছাই দিয়াছে যে অবহেলে !

Scanned with CamScanner

যাহাদের মুখ নিরখি জননী ! পাশরি' অতীত দুখ্,
ভবিষ্যতের আশায় তোমার ভ'রেছিল পোড়া বুক।
তাহাদের মাঝে দুটি শুকতারা অকালে পড়িল ঝ'রে,
কাঁদো অভাগিনী পল্লী জননী ! কাঁদো আজি উচ্চঃস্বরে।

(মাণ্ডুন্দী)

কেন এই আঁখিজল

কেন হায় আঁখিজল ? অবিরল !
অসহ বেদনা কেন ? হৃদি টলমল !
পাষাণে খুঁড়িলে মাথা
লাভ—শুধু পাবে ব্যথা ;
জান না কি এই কথা ? তবে কেন চঞ্চল ?
কেন তবে আঁখিজল ?
দরদী ভাবিয়া যারে
সমর্পিলে আপনারে ;
ভাগ্য দোষে সেই যে রে দলিল চরণতল !
তথাপি এ আঁখিজল ?

(লালবাগ, আশ্বিন ১৩৪১)

ক্ষণিকা

আমি জানি পূর্ণ নাহি হবে মোর বাসনা ;
বামনের চাঁদ ধরা—শুধু মিছে ছলনা।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে
দেখা দিয়ে অভাজনে
কাঁদাও পরাণে মনে, বাড়ে শুধু যাতনা॥

নিমেষের তরে শুধু দেখা যদি দাও প্রিয়
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাকি করুণা নয়নে চাহ,
আমার ত কিছু নাই,
যাহা দিয়ে তব ঠাঁই
বিনিময়ে শুধু চাই তব প্রেম অনুগ্রহ॥

আমি শুধু চাই প্রিয় তোমার মুখের হাসি
অধিক চাহিতে মোর—ভরসা আসে যে নাশি'
তুমি শুধু দেখা দিও
করুণা নয়নে চেও
কৃপণ কভু না হো'য়ো বিলাইতে হাসি রাশি।

(লালবাগ, ২০শে ভাদ্র ১৩৪১)

Scanned with CamScanner

মানস-প্রতিমা

কে গো তুমি একাকিনী দাঁড়ালে আসিয়া
প্রাণের গোপন পুরে ;
—যে বাসনা ছিল দূরে,
সে আজি কেমন করে উঠিল নাচিয়া।

মনে ভেবেছিনু বুঝি হৃদয়ে আমার
আলোর কিরণ রেখা
বুঝি বা পাব না দেখা,
বুঝি মোর ভাগ্যলিখা চির অন্ধকার।

বহুদিন বহুস্থানে খুজিয়াছি বৃথা ;
মানস-প্রতিমা মম
প্রভাত স্বপন সম
আঁকিয়া মোহন ছবি লুকায়েছে কোথা।

আজি বুঝি হেথা তার পেয়েছি সন্ধান
কে তুমি গো হে সুন্দরী ?
স্বপ্ন রূপ পরিহরি
দাঁড়ালে সম্মুখে আসি প্রসন্ন বয়ান ?

তোমার প্রসন্ন চোখে হেরিয়াছি আমি,
যার তরে এতদিন
কিবা রাত্র কিবা দিন
ভ্রমিয়াছি শ্রান্তিহীন—সে যে তুমি !

এতদিনে হেরিলাম মানস-প্রতিমা
কিন্তু তবু ভয় পাই—
প্রকাশিতে নাহি চাই
মনে ভয় প্রকাশিলে ধরা বুঝি দেবে না।

পুরিবে আমার আশা—সে আশা দুরাশা।
সাধ মোর সঙ্গোপনে
শুধাই কাতর প্রাণে—
জীবনে কখনো কি গো মিটিবে না তিয়াসা ?

প্রাণের গোপন পুরে যে সুপ্ত কামনা
সঞ্চিত হইয়া আছে
প্রকাশিতে তব কাছে
চাহিতেছে অনিবার অশান্ত রসনা।

আমার বাসনা—হৃদে পূজিব তোমায়,
সাজাইব ফুলদলে
ফুলমালা দিব গলে ;—
ভাঙ্গিবে কি সাধ মম শত ব্যর্থতায়!

হৃদয় কপাট তব উন্মুক্ত করিয়া
কবে দেখাইবি ধনি !
হে মোর নয়ন মণি !
কত দিন রব আর পথ পানে চাহিয়া !

(লালবাগ, ১৫ ভাদ্র ৪১)

উদয়-অস্ত

সূর্য্য গেল অস্তাচলে
পশ্চিমের রক্ত-রাঙা আকাশের ভালে।
ও পারের তরুশিরে আঁধার ঘনিয়ে আসে।
সচমক ত্রাসে
বিহগ কাকলী সুর মিশে যায়
আকাশের গায়
সন্ধ্যা বায়ু সাথে।
আঁধার ঘোমটা খুলি সহসা পশ্চাতে,
রাশি রাশি হাসি নিয়ে
সুধাময়ী বিধুরাণী, পূরব তোরণ দিয়ে
প্রবেশিল বিশ্ব-রঙ্গালয়ে ধীরে।
বসি আমি নদী তীরে
রঙ্গ দেখি একাকী হেথায়।
সমীরণ চামর ঢুলায়
প্রেম ভরে ;
কল কল স্বরে
নিরবধি।
শোনায় গুঞ্জন গান শ্রাবনের ভরা নদী।
হৃদয় আকাশে মোর
নাশিয়া তমসা ঘোর

হঠাৎ উঠেছে আজি পূর্ণিমার শশী।
সর্ব্বনাশী
রূপের আভায়
সমীরণ সম মন উড়ে যেতে চায় ;
কামনার পুষ্প রাশি পায়েতে লুটায়।
কিন্তু হায় !
ফিরে নাহি চায় মোর পানে।
গরবিনী গর্ব্বভরে দলিয়া চরণে
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে সে পুষ্প রাশিরে
আপনার পথে চলে যায় ধীরে।
নিস্তব্ধ কামনা—
কোনো কালে যাহা বুঝি প্রকাশ হবে না,
সে আজি হতাশে
অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
মরে গুমরিয়া—
ব্যর্থ মৌন মন নিয়া।

———

(লালবাগ, শ্রাবণ ১৩৪১)

ব্যর্থ প্রেম

(নারীর উক্তি)

ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা
কাজ নাই ভালবাসিয়া,
কাঁদাইয়া যদি সুখ পাও—তবে
কাঁদিব জীবন ব্যাপিয়া।

আমি সারাটি রজনী বসিয়া
কাঁদিয়া দিয়াছি ভাসাইয়া
(ওগো) তবুও কি তব পুরেনি কামনা
রহিয়াছ মুখ ফিরাইয়া !

রেখেছিনু ফুল তোমারে পূজিতে
তুমি ত এলে না সে পূজা লইতে,
(নিঠুর ! নিঠুর হে !)
ভাবিয়াছ বুঝি দীনা অভাগীরে
কিবা ফল ভালবাসিয়া—
(ওগো) কাজ নাই তবে আসিয়া !

ভুলে যাও সখা অতীতের কথা
আমারে স্মরিয়া পাইও না ব্যথা ;
(তব) সুখের কণ্টক চলে যাবে আজি
কাজ নাই আর ভাবিয়া—
(ওগো) যাইতেছি আমি চলিয়া।

তুমি সুখে থাক্ আমি চলে যাই,
ব্যথা হোক্ সাথী সুখে কাজ নাই ;
এ জীবনে যদি না পাই তোমারে
কাজ কিবা আর বাঁচিয়া—
(ওগো) স্মৃতির বেদনা বহিয়া।

যাক্ ছিঁড়ে মোর মরমের তার
মরণ আসুক নিকটে আমার ;
(মম) সুখের প্রদীপ নিভে যায় যদি
কিবা ফল তবে বাঁচিয়া—
(প্রিয়) মরণে লইব বরিয়া।

(লালবাগ, আশ্বিন ১৩৪১)

ব্যর্থ প্রেম

(পুরুষের উক্তি)

(আমি) সারা নিশি জাগি বসে আছি প্রিয়া ভুলিয়া,
তব তুমি কই এলে না,
মন-ফুলহারে যে মালা গেঁথেছি
সে মালা ত গলে নিলে না !
নয়নের জল মানে না আগল
মরম বেদনা ফুকারে,
দীরঘ নিশাসে কেঁপে উঠে বায়
—প্রিয়া আজি মম কোথারে !

Scanned with CamScanner

এলে নাক' তুমি ওগো অকরুণা,
নিদয়ে, হৃদয় ভাঙ্গিলে !
যত ছিল মোর পূজা-উপচার
ভাসাইনু আজি সলিলে।
ওগো সখি, আজ মাগি যে বিদায়
অশ্রুসিক্ত নয়নে,
আমারে ত আর নাহি প্রয়োজন
তাই বুঝি নাই স্মরণে ?
ভুলে যাও মোরে ক্ষতি কিছু নাই
ভুলিবে কি তবু সে কথা,
নীরব নিশীথে এই নদীতীরে
দোঁহে গেয়েছিনু যে গাঁথা।
ভুলিবে কি হায় সে মধু নিশায়
জোছনা প্লাবিত কুটীরে,
কে আসি প্রথম পূজিল তোমায়
দাঁড়াইল হাসি' শিয়রে ?
কাহার গলায় পড়াইলে মালা
জড়িত সোহাগ-সরমে ?
কার বুকে তুমি লুকাইলে মুখ
শিহরি মরমে মরমে ?
কে আসি প্রথম খুলিল দুয়ার
পূজিল প্রেমের গানে ?
সেই সে প্রথমে—যখন কেহই
চাহেনি তোমার পানে !

ভুলে কি গিয়েছ সে সকল কথা—
এ কি শুধু তবে ছলনা ?
তুমি ভুলো বঁধু ক্ষতি নাই তাহে
ভুলিতে আমারে বোলো না !

* * *

আজিকে না হয় ঘিরেছে তোমায় শতশত গুণীভক্ত,
তোমার মোহন মুরতি সবায় করিয়াছে অনুরক্ত।
তাদের সবাই নানা গুণে গুণী দাঁড়াবার স্থান সেথা কই,
রূপে ধনে মানে তুলনা নাহিক—আমি কেবা ধূলিকণা বই !
আজি সাজিয়াছ অতি সুন্দর রাজ-রাজেন্দ্রানী বেশ,
বদনে তোমার গত দিবসের নাই কিছু স্মৃতি-রেশ !
ভবিষ্যতের রঙ্গিন নেশায় মাতোয়ারা তব মন—
গত রাতে যারে চুমিলে সোহাগে আজি সে দুঃস্বপন ?

* * *

তবে তাই হোক্ ওগো রাজেন্দ্রানী ! তুমি থাক সুখে, ভুলিয়া,
মরমের ব্যথা মরমে চাপিয়া যাই তবে আমি চলিয়া—
তুমি চিরসুখে অমলিন মুখে বিতর স্নিগ্ধ সুষমা,
আমি চিরতরে পূজিব গোপনে আমার মানস-প্রতিমা।

[লালবাগ, আশ্বিন ১৩৪১]

Scanned with CamScanner

খাঁচার পাখীর আত্মকথা

(১ম পর্ব্ব)

খাঁচার ভিতরে করিয়া বন্দী আমারে রাখিল যবে,
তখন হইতে আঁটিনু ফন্দী বাহিরে যাইব কবে!
সেই একদিন লোভেতে পড়িয়া চাউল খাইতে আসি'
আনমনে যবে ধামার উপরে বসিনু বারেক হাসি';
কে জানিত হায় দুষ্ট মানব লুকায়েছিল যে কোথা—
দুটি চা'ল যবে মুখেতে নিয়েছি অমনি সে আসি হোথা,
জালেতে জড়ায়ে ধরিল আমারে রাখিল খাঁচায় পুরে—
ভেঙ্গে দিল মোর সোনার নিবাস অসীম আকাশ জুড়ে!
দূর দিগন্তে আকাশ প্রান্তে উৎসাহ ভরে ছুটি'
স্বাধীন চিত্তে উড়িতে পাব না আর ত বাতাসে লুটি'!
আর ত' হবে না প্রিয়জন সনে সুমধুর আলাপন!
লোহার খাঁচায় সারাটী জীবন করিতে হবে যাপন!
হায় হায় ওরে নিঠুর মানব! তোরা কি বুঝিবি দুখ্;
পরাধীনতার কি যে সে বেদনা—বুকে বাজে কতটুক্!
ক্ষমতার মদে আজিকে ধরারে সরা করি অনুমান,
দুর্ব্বল যারা তাদেরি উপর হানিছ তীক্ষ্ণবান!
মনে ভাব বুঝি আমাদের প্রাণে সুখ দুখ জ্ঞান নাই,
খাঁচার ভিতরে আছি বড় সুখে, ভাবিতেছ বুঝি তাই?
দয়া ক'রে রোজ দিয়ে যাও তুমি দুটি ছোলা—কিছু জল,
প্রতিদানে মোর গান শুনিবারে কর কত শত ছল।

বুকে যার বাজে শেল অহরহ অধীনতা অপমান;
সে কি পারে হায় তুষিতে তোমারে গাহিয়া মধুর গান?
তোমাদের দেওয়া দয়ার খাবার বিষ লাগে মোর মুখে,
খাবার দিলেও ঠকারী তোমায়—? জাননা—সে কত দুখে!
আমার বেদনা বুঝিতে পার না তাই দাও কত গালি—
"—নিমকহারাম! যে দেয় খাইতে তাহারেই কামড়া'লি?"
মুখে বল তুমি মোরে ভালবাস এ কী তব ভালবাসা?
ভালবাস যারে—বন্দী করি' তারে নাশ তার সুখ আশা!
দোহাই তোমার! আর বোলোনা'ক ভালবাস মোরে তুমি!
রেহাই পাইলে তব দয়া হ'তে বাঁচিয়া যাইব আমি!

* * *

কতদিন হতে করেছি যতন খুলিতে খাঁচার দ্বার,
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছি সদা কঠিন লোহার তার!
মেহনৎ শুধু হইয়াছে লাভ ভাঙ্গিতে পারিনি যাহা,
আজি এ কী হোলো কেমনে হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে তাহা!
সদয় বিধাতা বুঝি এতদিনে শুনিয়াছে ক্রন্দন!
বুঝি এতদিনে পাইনু ফিরিয়া জীবনের স্পন্দন!
ওই নীলাকাশ ডাকিছে আমারে ভাসিতে তাহার বুকে,
শীতল বাতাস কহে কানে কানে—'বাহিরাও চুপে চুপে'.....

* * *

মুক্তি! মুক্তি!—আহা কি শান্তি পুনঃ কত যুগ পরে—
আবার এসেছি মুক্ত বাতাসে পুরাতন খেলাঘরে!

Scanned with CamScanner

প্রিয় বনভূমি সাদরেতে পুনঃ
যোগাবে ক্ষুধায় ফল,
পিপাসায় প্রাণ করিবে শীতল
অগাধ নদীর জল।
মানুষের দেওয়া দয়ার খোরাক
কোনোদিন নাহি চাই,
স্বাধীন ভাবেই মরণের কোলে
শেষে যেন ঠাঁই পাই!
তোমরা আজিকে পাও কেন দুখ
উড়ে গেছে পাখী ব'লে,
পরাধীনতার কঠিণ নিগড়ে
বাঁধিয়া পাখীরে ছলে
যেই সুখ পাও; তার চেয়ে যদি
নিজহাতে সমাদরে
দাও তারে ছেড়ে অসীম আকাশে
স্বইচ্ছায় উড়িবারে,
পাইবে তাহাতে বিমল শান্তি
আত্মসুখ অনিবার—
কয়টি দিনের বন্ধু আমার
আসি তবে— ? নমস্কার।

———

[লালবাগ, আশ্বিন, ১৩৪০]

খাঁচার পাখীর আত্মকথা

(২য় পর্ব্ব)

"ওগো প্রিয় সাথী বন্ধুরা সব! আবার এসেছি ফিরে—
কারাগার দ্বার ভাঙ্গিয়াছি আজি—" কহিলাম ধীরে ধীরে।
মোর আহ্বানে আসিল যতেক পুরাতন সাথী মোর,
বিরহের জ্বালা নিভা'ল ক্ষণেক আনন্দ আঁখিলোর।
ক্ষণকাল পরে কহিল তাহারা—"শুন ওগো মহারাজ,
চল আজি দূরে নদীর ওপারে পল্লী ক্ষেতের মাঝ।
এ পাড়ে নব্য ভব্য সহর অহঙ্কারে মনে ভাবে,
দুনিয়ার যত প্রকৃতির দান—ভোগ্য তাদেরি হবে।
তাহারা ভদ্র—নহে ত' ক্ষুদ্র, সকলে বুদ্ধিমান,
তারা কোন্ দুখে খাটিয়া মরিবে ক্ষেতে ফলাইতে ধান!
তা'রা আছে শুধু বুদ্ধির বলে ডাকাতি করিতে দিনে,
তা'রা আনে টাকা বুদ্ধি বেচিয়া—টাকায় খোরাক কিনে।
হেথা আছে বটে বড় বড় বাড়ী বিবিধ বাহন যান,
ছাতের উপরে বসিলে শুনিবে কত না মধুর গান;
হেথা আছে বটে দোকানে সাজানো মনোহর দ্রব্যচয়—
সে সকলি শুধু তাহাদের তরে—গরীবের কিছু নয়!
টাকা দিলে হেথা সকলি মিলিবে নতুবা শুকিয়ে মর,
দুনিয়ার তাহে কিছু ক্ষতি নাই বড় ত' থাকিবে বড়।
ও পারে—পল্লী-জননী দুখিনী দীনা বঙ্গ-বধূ সম
সহে চিরদিন শত অত্যাচার—অবিচার নিরমম।

তথাপি নীরবে বিলায় সবারে তাহার স্নেহের দান,
তাহারই তৈরী বিবিধ শষ্যে এপারের বাঁচে প্রাণ।
তবুও এপার করে না স্বীকার ওপারের উদারতা,
ভাবে—'এ ত' তার ন্যায় অধিকার, 'তার তরে কৃতজ্ঞতা'?
এপার নিত্য শুষিয়া ওপারে বিলাসে কাটায় দিন—
ওপার—সহিছে সকলি নীরবে—দিনে দিনে তনু ক্ষীণ!
এপার ব্যস্ত নিজেরে লইয়া জানে না ত' আর কারে,
হেথা তো মোদের মিলে না খোরাক যাইতেছি তাই 'পারে।"
ভাবিলাম মনে—এ ত' বড় জ্বালা! কেমনে যাইব 'পার,
অত দূর পথ উড়িয়া যাইতে শকতি ত নাই আর।
বহুদিন থাকি খাঁচার ভিতরে ভুলিয়াছি সব কাজ,
নিজের খোরাক নিজেই যোগাড় কেমনে করিব আজ!
অপরে নিত্য যোগায়ে অন্ন পঙ্গু করেছে মোরে,
এ কথা ত' হায় বুঝিনি তখন! কি হোলো আমার ওরে!
মনোব্যথা চাপি' মনের মাঝারে প্রকাশি' কহিনু তাই,
"বহুদিন পরে হয়েছি মুক্ত, আজি মোর ক্ষুধা নাই।
চলে গেল তা'রা নিজ নিজ কাজে, আমি একা বসি গাছে
ভাবিনু কত যে পুরানো কাহিনী—সীমা কি তাহার আছে!
সেই সে অতীতে, জীবন প্রভাতে আমিও ওদেরি মত,
দূর দূরান্তে ক্ষেত্রপ্রান্তে শষ্য খেয়েছি কত!
উড়েছি সুদূর উচ্চ গগণে—হেরিতে আকাশ তল,
তুচ্ছ করিতে সমীর-গর্ব্বে ধরেছি কতই ছল।

সে সকলি শুধু স্বপন কাহিনী মন মাঝে আজ ভাসে
অতীত দিনেরে ফিরায়ে চাহিরে—বিধাতা লুকিয়ে হাসে!

* * *

দিনান্তের রবি চক্রবাল'পরে ক্লান্ত দেহ রাখে যবে
ফিরে আসে মোর সঙ্গীর দল আনন্দ কলরবে।
আলাপে গল্পে কাটায়ে ক্ষণেক ধায় নিজ বাসা পানে,
সুখ-সুপ্তি আনি দিল বিভাবরী ঘুম পাড়ানোর গানে।
নীরবে আমিও বসিয়া রহিনু নিদ্ নাই চোখে মোর—
ভাবিয়া ভাবিয়া দীরঘ যামিনী জাগিয়া করিনু ভোর।

* * *

এইরূপে কাটে দিন দুই তিন অনিদ্রায় অনাহারে,
তবু নিজ হাতে খোরাক জোটাতে মোর মন নাহি সরে।
দুষ্ট মানব শুধু যদি মোর স্বাধীনতা লোপ করি,
খাটিয়া খাবার উপায় রাখিত অধীন জীবন ভোরই;
তবে আজ হেন হরিষে বিষাদ মোর কেন হবে হায়,
শরীরে ও মনে পরাধীন আজ কেমনে কাটাব তায়?
বুঝিলাম আজি—নিয়তি আমায় টানিছে মরণ পানে,
অপরে কি পারে বুঝিতে আমারে কি জ্বালা আমার প্রাণে?
স্বাধীন থাকিলে দুই চারি দিনে অনাহারে যাবে প্রাণ,
ফিরি যদি পুনঃ পুরানো খাঁচায়— ? নিদারুণ অপমান
চির বন্দী'পরে মরণ অধিক হানিবে তীক্ষ্ণ বান—
শেষে একদিন খাঁচাতেই হবে জীবনের অবসান!
তবু সেই ভালো—যাইব ফিরিয়া পুনঃ সেই খাঁচা-মাঝ,
শক্তিবিহীন দেহটায় মোর প্রয়োজন কিবা আজ?

আমি ত মরেছি—তবু যদি হায় দেখিয়া আমার হাল,
অন্য সকলে হয় সাবধান—ছেঁড়ে মায়াবীর জাল ;
তবে পোড়া প্রাণে ভাবি মনে মনে ক্ষণেকের তরে হায়
'আপনি মরিয়া অপরে বাঁচানু'—সান্ত্বনা পাব তায় ।

* * *

'স্বেচ্ছায় পুনঃ খাঁচার ভেতরে ফিরিয়া এসেছি ভাই,
বাহিরের দ্বার ক'রেছ বন্ধ খাঁচাতে দাও গো ঠাঁই !
—লঙ্কা হস্তে লুব্ধ বালক আমারে ডাকিল যবে,
ধরা দিনু নিজে—ফিরিল বালক বিজয়ীর গৌরবে ।
বুঝিল না শুধু, কেন পুন আসি' ধরা দিনু তার হাতে,
জানে না সে হায়, হাতে না মারিয়া মারিয়াছে মোরে ভাতে ।
যাক্ আর মোর ভাবনা নাহিক' সব সাধ আজ শেষ,
যে কয়টা দিন বাঁচিব এবার আরামে কাটাব বেশ ।
ঘৃণা করি তোমা, তবু ভালবাসি—শত্রু—তবু বন্ধু মোর,
শুনিয়া আমার গোপন কাহিনী কাটিল কি মোহ ঘোর ?
নিবেদন এক বন্ধু আমার শুন শুন দিয়া মন,
আমার জীবনে পাখী পোষা সাধ করিও হে সমাপন ।
হরি' অপরের স্বাধীনতা সুখ কিবা ফল আছে তায়
ভাব' দেখি মনে নিজে বন্দী হ'লে কি করিতে তবে হায় ।
বন্ধু আমার ! মাঝে মাঝে এবে শোনাব আমার গান,
শুধু তুমি দিও ফল, আর জল করিবারে মোরে পান ।

———

(লালবাগ, আশ্বিন ১৩৫০)

নিয়তির খেলা

মধুময় মধু মাসে মধুর হাসিয়া
শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ গিয়াছে ডুবিয়া ।
পরিশ্রান্ত পল্লীবাসী নিদ্রায় মগণ,
হেরিছে কতই বুঝি মধুর স্বপন ।
নীরব প্রকৃতি শান্ত স্তব্ধ সুগম্ভীর,
ঝটিকার পূর্ব্বে স্থির যথা সিন্ধু নীর ।
বিষণ্ণা প্রকৃতি দেবী, বুঝি সঙ্গোপনে
হেরিয়া কুটিল হাসি নিয়তি নয়নে ।
আঁখি মুদি ধ্যানরতা । আকাশের ফাঁকে
তারা দল উকি মারি এ উহারে ডাকে
হেরিতে নিয়তি-লীলা ।
হাসি অট্টহাসি
সহসা নিয়তি দেবী উল্লাসে উচ্ছসি'
উদ্গিরিলা কালানল—রুদ্র অভিমান—
হাতে লয়ে প্রজ্জলিত জলন্ত নিশান
মাতিল পাবক । লেলিহান শিখা তার
ধূ ধূ করে চতুর্দ্দিকে ধায় অনিবার ।
ত্রাসিত বিহগকুল ছাড়িয়া কুলায়
কলশব্দে ভেসে যায় আকাশের গায় ।
গৃহের পালিত গাভী ছাগ মেষচয়,
মহাত্রাসে উর্দ্ধপুচ্ছে ধায় উভরয় ।

অকস্মাৎ জাগি উঠি হেরিল মানব
গ্রাসিছে সকলি তার দুর্দ্দান্ত দানব—
ভয়ঙ্কর অগ্নিরূপে। আর্ত্ত হাহাকারে
কাঁদি উঠে নরনারী বিকট চীৎকারে।
পলাইয়া যায় সবে লইয়া পরাণ,
পিছনে চাহিয়া দেখে জ্বলন্ত শ্মশান!
কাঁদি কহে—"ভগবান! কি করিলে হায়!
জীর্ণ গৃহে থাকিতাম দীন হীন প্রায়,
করিনি ত' কা'রো ক্ষতি—কেন অকারণে
আমার সর্ব্বস্ব তুমি পোড়ালে আগুণে?"
নিয়তি হাসিয়া কহে—"তোর ভগবান
ভালবাসে তোরে—তাই ডেকে নিতে চান!
এতদিন বদ্ধ ছিলি গৃহের মায়ায়?
দয়া ক'রে তাই আমি পোড়ালেম তায়!
মায়া মুক্ত এবে তোরা—যাইবি স্বরগে!
ভাবিয়া কি হবে? হরি-চরণ স্মরগে!
অনাহারে শীর্ণ দেহ জীর্ণ বস্ত্র গায়,
তবু বল আছি ভাল হরির কৃপায়!
দেখিতে পাও না নিতি করিছে শোষণ
মদ মত্ত 'অহঙ্কার' তব হ'ক্ ধন।
অবিচার নিত্য হানে শেল তব বুকে,
তবু বল "নির্ব্বিবাদে আছি বড় সুখে"!
শোন্ ওরে মূর্খ নর—আমি যে নিয়তি—
নির্ম্মম কঠোর হস্তে ভাঙ্গি নিতি নিতি

এইরূপ সুখের স্বপন। যবে দেখি
বুভুক্ষায় প্রপীড়িত মানবের আঁখি
শোষকের অত্যাচারে উঠে নাই জ্বলি';
শাস্ত্রের বিধান বলি' আপনারে ছলি'
অনন্ত বিশ্বাসে মানি' অন্যায় বিচার
ভাবে মনে এই তার ন্যায্য অধিকার;
যবে দেখি, এইরূপে করিয়া বিফল
প্রকৃতির সাম্য নীতি, বাড়িছে কেবল
স্পর্দ্ধা অন্যায়ের;—হানিয়া তখনি
বজ্র অতি সুকঠিন,আলোড়ন আনি'
দেই প্রাণে তাহাদের। সুখ-নিদ্রা হতে
টানি আনি' তাহাদের অসীম জগতে
রিক্ত ক'রে ছেড়ে দিই। অকরুণ প্রাণে
কভু "অনাবৃষ্টি" কভু জলের "প্লাবনে"
হানি কভু "ভূমিকম্প" "অগ্নিকাণ্ড" আর—
ভূয়া সুখ স্বর্গ ভাঙ্গি করি ছারখার!
হায়রে তথাপি তার হুশ নাহি হয়!
সকলি ললাট-লিপি ব'লে মেনে লয়!
যে কারণে তারে আমি করি সর্ব্বহারা,—
না বুঝিয়া দোষে মোরে। অশ্রুজল ধারা—
ঝরে তার চক্ষু হ'তে; তবু নাহি চায়
প্রতিকার এর। তথাপি তাহারা হায়—
সবলের পদপ্রান্তে নতশিরে বসি'

Scanned with CamScanner

মাগি' ল'য়ে ভিক্ষা অন্ন, মুছি অশ্রু, হাসি
আনি মুখে কোনো মতে ;—তারা শুধু চান—
মাথা গুজিবার মত এতটুকু স্থান !
ওরে রে অবোধ নর ! ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়ি'
দাঁড়া দেখি একবার বক্ষেরে প্রসারি' !
ভিক্ষা নয়—দাবী কর সবার সমান
আভিজাত্য অহঙ্কারে করি খান খান।
ছুনিয়ায় পরিচয়—মানুষ সবাই
হীন, নীচ, ছোট, হেয়, কেহ নয়—তাই
করিয়া প্রমাণ দাঁড়াবি যেদিন সবে—
নিয়তি সেদিন তোর চিরদাসী হবে।"

(লালবাগ ফাল্গুন, ১৩৪০)

বিদায় স্মৃতি

বিদায় ! বন্ধু ! বিদায়—
"কেন চলে যাবে ?" সকলে শুধায় ; আমি কি কহিব হায়,
জীবন-খাতার শূন্য তুই পাতা অমূল্য মণি দিয়া—
ভরিয়া লইনু তোমাদের দ্বারে—ক্ষুধিত এ মোর হিয়া।
অপরিচিত এ অজানা পথিকে হু'দিনের আলাপনে,
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি সুধাধারে সিঞ্চিলে সযতনে।
প্রবাসের ব্যথা কোনদিন তরে মনে ত' জাগেনি হেথা,
পরাণে তাহাই ধ্বনিছে সদাই সুগভীর আকুলতা।

এ প্রীতি বাঁধন ছিঁড়িতে পারিব নাই সে শকতি মোর,
রবে চিরকাল স্মরণে জড়িত অচ্ছেদ্য বাঁধন ডোর।

* * *

তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে হঠাৎ শুনিনু যবে,
মরমে সহসা কি যেন সে ব্যথা পশিল নীরব রবে।
সেদিন প্রথম দেখিনু চাহিয়া তোমরা সকলে মোরে,
করেছ আপন বন্ধু স্বজন—সরায়ে রাখনি দূরে।
সেদিন দেখিনু মায়ের আশিস মন্দাকিনী ধারা সম,
হেথাও সতত পড়িছে ঝরিয়া নীরবে মস্তকে মম।
সেদিন দেখিনু বন্ধুরা সব অকৃত্রিম প্রীতি ডোরে—
কি জানি কখন্ হেথায় নীরবে বাঁধিয়া ফেলেছে মোরে।
সেদিন দেখিনু হেথাও রয়েছে শুভাকাঙ্খী গুরুজন,
পিতা ভ্রাতা সম তাঁরাও চাহেন মঙ্গল অনুক্ষণ।
হেথায় পেয়েছি ভাইবোন আর—বালক বালিকা কত ?
প্রাণ হ'তে প্রিয় যাহারা সকলে সদা মম অনুগত।
হেথায়ও হইনি বঞ্চিত আমি ভগিনীর স্নেহ হতে'— ;
সবই এককালে উঠিল ভাসিয়া নীরব চিন্তা স্রোতে।

* * *

মনে ভাবি তাই কেমনে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা,
বিপুল আবেগে ভাষা হয় রোধ মুখে নাহি সরে কথা।
তোমাদের কাছে যা পেয়েছি আমি ভরে আছে তাহে বুক
প্রতিদানে হায় দিয়াছি ফিরায়ে আমি তার কতটুক্ ?

Scanned with CamScanner

দুদিনের তরে আসিয়া হেথায় আবার চলিনু ফিরে—
নিয়ে গেনু শুধু প্রীতি তোমাদের জীবন-পেয়ালা ভ'রে !
বিদায়ের কালে কি আর কহিব ? অনুরোধ শুধু তাই
ক্ষণিকের তরে কা'রো প্রাণে ব্যথা যদি দিয়ে থাকি ভাই,
ভুলে যেও তাহা নিজ নিজ গুণে পুষিয়া রেখো না তারে,
অটুট থাকুক প্রীতির বাঁধন জীবনের পারাবারে ।
তোমরা সকলে দেহ গো বিদায় আজি সুপ্রসন্ন মনে,
প্রণতি জানাই গুরুজন পদে—ভালবাসা বন্ধুজনে ।
ছোটদের প্রতি জানাই আশিস আর স্নেহ ভালবাসা,
মলিনতা হীন চিত্ত তাদের—ভবিষ্যতের আশা— ।
তারাও আমারে বাসিয়াছে ভালো বাঁধিয়া প্রীতি বন্ধনে,
তাহাদের ছেড়ে চলে যেতে আজ বড় ব্যথা জাগে মনে !
মমতাবিহীন কর্ত্তব্য কঠোর ডাকিয়া কহিছে সবে—
"সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে !"
—তাই হোক্ তবে ; মর্ম্ম ভেদি' উঠে দীরঘ নিশাস বায়,
তোমাদের আজি চলিনু ছাড়িয়া—বিদায়—বন্ধু—বিদায় ।

———

(মুর্শিদাবাদ, ১লা আশ্বিন, ১৩৪১)

"এই করেছ ভালো"

প্রভু ! এই করেছ ভালো !
এমনি করে অন্তরে মোর দুখের আগুন জ্বালো !
যখন থাকি সুস্থ দেহে কর্ম্মরত এ মরতে,
তোমার কথা রয় না মনে সারা দিনের জীবন স্রোতে ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ভাবি মনে, কর্ত্তা আমি !
তুমি তখন আপন মনে হাসো বসে অন্তর্যামী !
সুখের দিনে মনের মাঝে ভাসে কি গো তোমার কথা—
ভাবি তখন এম্নি করেই বইবে বুঝি দিনের খাতা !
আজকে দারুণ রোগের জ্বালা পোড়ায় সারা দেহ মন,
তাহার মাঝে মনে জাগে তোমার দয়া সারাক্ষণ ।
সুখের দিনে চাইনি তোমায়—তবু ভালবাসো মোরে !
রোগের জ্বালা নিভায় তোমার শান্ত নীরব অশ্রুধারে ।
বন্ধু—ওগো ব্যথার ব্যথি ! তোমায় যদি ভুলি কভু,
এমনি করেই তীব্র দহন দিও সেদিন জগৎ প্রভু !

(সোদপুর, 'প্রতিষ্ঠান' হাসপাতাল, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬)

Scanned with CamScanner

পরেশবাবুর দুঃখ

"ওরে আমার সাধের চুল !
আজকে তোরে বিদায় দিতে পরাণ যে রে শোকাকুল !
মনের সাধে আয়না ধরে ছাঁটিয়েছিলাম যখন তোরে,
'ভগা'র মনে এইটা ছিল তখন কি হায় জানতাম ওরে !
—ছাঁটা যখন সারা হ'লো নাপিতটারে বিদায় ক'রে,
দোতালার সেই বারান্দাতে নানা ভাবে আয়না ধরে।
এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তবু মন ওঠে না;
চিরুনি দিয়ে বারে বারে আঁচড়িয়েও সাধ মেটে না।
অবশেষে কলতলাতে সযতনে সাবান দিয়ে
ঘণ্টা দেড়েক কসরৎ করি গোপন মনের আশা মিটিয়ে।
তারপরেতে ঘণ্টাখানেক চিরুনী সহ আলাপন
পরিপাটি সিঁথীর ঘটা—বেজায় খুসি ?—ভরে মন ।
নিত্য কতই সোহাগ ভরে আদর করি আমি তোরে
আজকে যে তোর বিয়োগ ব্যথায় চক্ষে যে মোর অশ্রু ঝরে।
ডাক্তারে আজ বলে গেল—"চুলগুলো যে কাটতে হবে
—মায়ের দয়া—মস্তকেতেও একটুকু স্থান নাহি রবে।
শীতলা মার অনুগ্রহে শীতল সারা দেহ মন,
তার 'পরে এই মধুর বাণী—(যেন) গোদের উপর বিস্ফোরণ!
দোহাই মাগো দয়ায় তোমার বিছানায় যে টিক্‌তে নারি,
নিদ্রা দেবীও তোমার দয়ায় পথ দেখেছেন তাড়াতাড়ি।
তোমার দয়ায় সবার মাঝে আমরা যে আজ স্পৃশ্য নয়,
দূরে থেকেও বল্‌তে কথা সবার প্রাণে লাগে ভয়।

তোমার দয়ায় বন্ধুজনে দূর থেকে দেয় নমস্কার,
কাছে এলে পাছে তোমার কৃপায় তাঁরাই হন বা পার !
শীতলা মা ! বড়ই শীতল তোমার মধুর পরশখানি।
অধিক শীতল কোরো না মা ! তবেই তোমায় ধন্য মানি !
ডাক্তারবাবু আদেশ দিলেন, অনিচ্ছায়ও মানতে হবে,
বন্ধু ! তোমার বিয়োগ ব্যথা—প্রাণের দায়ে সবই স'বে।
মাসেক পরে এসো ফিরে আগের মত পুনর্ব্বার,
এ ক'টা দিন পথ পানে রইব চেয়ে—নমস্কার !"

—— ——

['প্রতিষ্ঠান' হাসপাতাল, সোদপুর ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬]

বেগুন মাহাত্ম্য

আনাজের সেরা এ জগত মাঝে শুধু বেগুন—ওগো বেগুন,
তোমরা কেন তা' বুঝিতে পার না তাই আমি ভেবে খুন !
ফাল্গুন মাসে পোকাধরা গাছে ঝুলিতেছে শত শত,
কী মধুর নাম ! সুবঙ্কিম ঠাম ! বীচিভরা মনোমত।
দুনিয়ার লোক জানে না ত' হায় ভিটামিন কিসে কত,
বিকায় না তাই বাজারেতে ইহা পড়ে থাকে ঝুড়ি যত।
মরুকগে, লোকে যা করে করুক, বাঁচতে যদি তোমরা চাও,
গভীর বিশ্বাসে আর শুদ্ধ মনে বেগুন খাও, বেগুন খাও !
বেগুন খাও শুদ্ধ মনে—চুলকানি আর ধরবে না,
বেগুন খাও পিয়াজ সনে,—মাথার অসুখ ঘটবে না।

Scanned with CamScanner

বেগুন খাও বীচি সহ ;—পোকা তাতে যদিই থাকে,
মাংস সম বলকারী আরামেতে খাও গো তা'কে।
চৈত, বোশেখে বেগুন খেলে চোখের জ্যোতি যায় যে বেড়ে
চস্‌মা নিতে হয় না তবু মূর্খ নরে চায় না এরে !
তোমরা যদি একেবারেই মনের প্রাণের তৃপ্তি চাও,
পরমাদরে ঘঁ্যাটের সনে বেগুন খাও বেগুন খাও !
বেগুন সম উপাদেয় পথ্য আর নেইকো ভবে,
হাসপাতালে যতই রোগী—বেগুনের ঘঁ্যাট দাও গো সবে !
তাড়াতাড়ি উঠবে সেরে দেহে পাবে নবীন বল,
মনের স্ফূর্ত্তি কমবে নাকো যতই থাকুক দুর্ব্বল !
বেগুন খেলে চুলকানি হয় ?—(হাঃ হাঃ) এ অর্ব্বাচীনের যুক্তি
—কে বলেছে ?—জানে কি সে বৈজ্ঞানিক শক্তি ?
পুরাকালের কুসংস্কার নেইকো কোনো ভিত্তি তায়,
আধুনিক বিজ্ঞানেতে বেগুন বীচির গাইছে জয় !
সবিরাম ও বিরাম জ্বরে, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায়,
কলেরা, বসন্ত, চুলকানি, খোস্‌, পাচড়া ও নিউমোনিয়ায়,
সকল রোগেরই ধন্বন্তরী বেগুন বীচির সিদ্ধ ক্বাথ,
পরশে ইহার দূরে যায় জ্বালা—আনমনে চলে গলায় ভাত।
যে কয়টা দিন এ জগতে আছ, নিরোগে ও সুখে থাকতে চাও?
তবে শ্রীবেগুনের স্মরণ লও হে বেগুন খাও বেগুন খাও !

* * *

বেগুন রন্ধন কথা শুন দিয়া মন,
যেমনে রাঁধিলে হয় অতীব উত্তম।
কচি বেগুন কখনও গৃহে না আনিবে,
ভিটামিন তাহাতে যে পুরা নাহি পাবে।

টিপিলে যাহার গায়ে নখ নাহি বসে,
মধু মাসে মরা গাছে ঝুলে যেই শেষে,
অতীব উত্তম চীজ দুনিয়ার মাঝে
ভিটামিন ইহাতে যে পুরাপুরি রাজে।
কুকারে চাপায়ে ইহা সিদ্ধ কর কষে
যাবৎ জলের সাথে নাহি মিশে শেষে !
অবশেষে দাও কিছু লবণ ইহাতে
অন্য মসল্লা নাহি দাও কোনো মতে।
ইচ্ছা যদি হয় কারো প্যাঁজ দিতে পারো
ভিটামিন তাহাতে যে জোর হবে আরো।
এমন সুপথ্য আর জগতে না হয়
এক সাথে গাও সবে বেগুনের জয়।

প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, ২৮।২।৩৬)

বসন্ত বন্দনা

কলকাতা আজব সহর সর্ব্ব লোকে কয়
শীত না পালাতে হেথা বসন্তের ভয়।
পিকরাজ কুহু ডাকে ঋতুরাজ আগমনে
সাথে আসেন সখা তাঁর রাসভ বাহনে।
আমরা যতেক জন রই 'কর্ম্মী আবাসে'
বসন্ত করেন কৃপা—ঋতুরাজ সখা সে।

গুটী যবে বাহিরায় সখারূপে সারা গায়,
সোদপুর 'প্রতিষ্ঠান-হাসপাতালে' সবে যায় ।
দৈবযোগে একদিনে আমি ও পরেশবাবু
বসন্তেরই আবির্ভাবে দু'জনেই হ'নু কাবু ।
চারু দা'র আদেশেতে বিছানাটা নিয়ে ঘাড়ে
দু'জনেই দিনু পাড়ি—শ্রীহরি স্মরণ ক'রে ।
টেলিফোনে বহু আগে এসেছিল সংবাদ
রোগীদের মহলে তাই পড়ে গেল আহ্লাদ ।
দেখিলাম হাসপাতাল কিবা চমৎকার,
এক পাশে সারাদিন কলের চীৎকার ।
অন্য পাশে সুরেনবাবু করেন বসতি
সদ্য-রোগ-মুক্ত রাজ 'রাজেশ্বর' সংহতি ।
আমরা আসিবামাত্র শ্রী"গোষ্ঠ" মহারাজ
তাড়াতাড়ি দেন সিট না করিয়া ক্ষণ ব্যাজ ।
হীরেনবাবু প্রবোধ দেন—না করিও ভয়,
সেরে গেলে কোনো কষ্ট পাবে না নিশ্চয় ।
সুরেনবাবু আসিলেন হস্তে দগ্ধ বিড়ি,
সহানুভূতি দেখালেন ছাড়িয়া ধূম্রগিরি ।
আমরা যখন বলিলাম "এ ত ঠিক নয়,
'শৃঙ্গীনাং শত হস্তেন' সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ।
অতএব মানে মানে আমাদের পরিহরি
মহাজন বাক্য স্মরি তাড়াতাড়ি পড়ুন সরি' ।"
হাসিয়া কহেন তিনি—এ ত মোর কর্ম্ম নয়,
তোমাদের না হেরিয়া প্রাণ স্থির নাহি রয় ।

মোরে না ধরিবে রোগে—সর্ব্ব রোগ জয়ী আমি - "
শুনিয়া এ হেন বাক্য হাসে বুঝি অন্তর্যামী !
রাত্রিকালে কন তিনি "ভাইরে এ মন্দ নয় !
তোমাদের সাথী বুঝি হইলাম নিশ্চয় !
সারা অঙ্গে হেথা সেথা সূচ সম ফুটে যেন
'চিড়িং' করিয়া উঠি' বাহিরায় অগ্নি হেন !"
প্রভাতে হইল তাঁর উৎকণ্ঠার শেষ—
শীতলা মা তাঁরেও কৃপা করেছেন বেশ !
তিনি কন—"মূলে ভুল, কবচটা গেল কোথা ?
দেশেতে খেতাম যদি কুমীর ডিমের ওষুধটা,
তাহ'লে কিন্তু ধরিত না কোনো রোগে আমারে,
এ কথা স্বীকার যদি না করেন—কই কারে ?
যাক্, এবার আপনারা শুনুন দিয়া মন,
শাল গাছের জন্মকথা—অপূর্ব্ব কথন ।—
শাল বনে ভয়ে কেহ নাহি যান পায়খানা,
কি জানি কখন বুঝি শালচারা দেন হানা ।
ভূমিতল পরিষ্কার কিছু নাহি দেখা যায়,
অকস্মাৎ ভুঁই ফুঁড়ি শাল চারা বাহিরায় !
একেবারে আধ হাত ! কিছু কম নয় এর ।
তাই লোকে ভয় পায়—কাজ নাই—গ্রহফের !
শাল চারা সম মম অঙ্গে গুটী বাহিরায়,
এই নাই ! অকস্মাৎ এই দেখ—দেখা যায় ।
যা হয় তা হোক তবে শুন এক কথা ভাই,
রোগে দিক্ যত জ্বালা মুখে কিন্তু হাসি চাই ।"

Scanned with CamScanner

এইরূপে সারাদিন চলে অনেক গল্প,
নব নব কল্পনা, সম্বল কি অল্প ?
অন্তরে রোগের জ্বালা পুড়ে সারা দেহ মন,
হাসি ও কথার মালায় চাপা দিই অনুক্ষণ !
মাঝে মাঝে কেহ বলে—"হরি হরি ! ভগবান" !
কেহ বলে—"জগদম্বা", "শীতলা মা কর ত্রাণ !"
জ্বর যত চেপে আসে, কথা আরো বেড়ে যায়,
গান ও কবিতা চলে অফুরন্ত উৎসপ্রায় ।
এইরূপ চলে রঙ্গ — হয় শুধু রসভঙ্গ
সাগু যবে পথ্যরূপে হন অভ্যুদয়,
আমরি ! কিবা সে রূপ — গন্ধ যেন অপরূপ
লইতে তাহার স্বাদ প্রাণে জাগে ভয় ।
'শ্রীগোষ্ঠ' হস্তেতে হেরি — প্রাণ চায় খাঁচা ছাড়ি
পলাইতে সুদূরের প্রান্তরের পার,
মনে হয় ভেক দলে — ভুলিয়া পুকুরে খালে
ডিম বুঝি পেড়ে গেছে বাটীতে আমার !
মোদেরে কাতর হেরি — মাষ্টারজী দয়া করি
অবশেষে সাগু হ'তে দেন অব্যাহতি,
পরিবর্ত্তে দুধ-মুড়ি — আসে পথ্যরূপে ধরি
যাবৎ রহেন জ্বর মোদের সংহতি ।
সেবক মোদের মাঝ — শ্রীগোষ্ঠ মহারাজ
নিয়মিত আনি দেন ঔষধ ও পথ্য,
আর দেন এক 'থালা' — তাতে হয় থুথু ফেলা
'কড়াই' দিলেন এক জানি না কি তথ্য !

পরে গোষ্ঠ দাদা কন্— — শুনুন্ মশাইগণ !
রাত্রিকালে করিবেন প্রস্রাব ইহাতে ,
শুনি মোর হাসি পায় — এরা একেবারে চায়
অক্ষম শক্তিহীন রোগী মোরে বানাতে ।

* * *

দিন কয় হ'লে গত — জ্বর বাড়ে ক্রমাগত
থেমে আসে উৎস-মুখ দারুণ জ্বালায়,
মায়ের কৃপায় চিন্ — বাহিরায় দিন দিন
শরীরের কোনো অঙ্গ রেহাই না পায় ।
একদা প্রভাত কালে — আসিল মোদের দলে
মান্দ্রাজি যুবক এক—বেলায়ুধ নাম,
রন তিনি 'প্রতিষ্ঠানে' — চিকিৎসক সন্নিধানে
মায়ের কৃপায় তা'রো অঙ্গে নাহি স্থান ।
বেচারীর সেরা দুখ্ — পারে নাকো এতটুক্
বুঝিবারে আমাদের বাঙ্গালীর ভাষা
আবার দাঁতের ফাঁকে — গুটী বাহিরিয়া তাকে
ছাড়ায়েছে কোনো কথা বলিবার আশা ।
তাহার সেবার তরে — গোষ্ঠ দা ভাবিয়া
দোঁহাকার ভাষা নাহি বুঝে দুইজন
ভাগ্যে ছিল 'রাজেশ্বর' — লইয়া সেবার ভার
দোঁহারে করিল ত্রাণ সকরুণ মন ।
যতই হোক্ দুরন্ত — সেবা কার্য্যে মূর্ত্তিমন্ত
তার ভয়ে গোষ্ঠদাও ছাড়ে ত্রাহি ডাক্,
এই আনে দুধ, ফল— — এই দেয় 'ডুস' জল,
সেবার প্রাচুর্য্যে রোগী হয় হতবাক ।

Scanned with CamScanner

একদিন সন্ধ্যাকালে খাইতেছি দুধ, ফল—
গোষ্ঠ দা' সংবাদ দেন ক্রমে পুষ্ট হয় দল।
"ট্যানারীর" 'রমেশ দা'—অগ্রজ পরেশ দা'র
আসিছেন অংশ নিতে ভ্রাতার রোগের ভার !
শুনিয়া সুরেন বাবু ওঘর হইতে কন্—
খোদার বিচার নাই শুন আজি সর্ব্বজন !
এক ভা'য়ে দয়া করে পুরেনিক' মনস্কাম,
তাই পুনঃ বড় ভা'য়ে অংশ তার দিতে চান।—"
ভাবিতে ভাবিতে সবে বিছানায় পড়ি শুয়ে,
রাত্রিতে রমেশ দাদা আসিলেন ব্যস্ত হয়ে।
কহেন কাতর বাক্যে "—ভাইরে ! এ বড় জ্বালা
কেমনে করিব শেষ দারুণ রোগের পালা—!"
মোরা দ্বিই সান্ত্বনা পরম বিজ্ঞের প্রায় !
কোনো ভয় নাই দাদা ! দু'দিনেই জ্বালা যায় !

* * *

সাতদিনে ছাড়ে জ্বর অন্ন পথ্য অত:পর
মনে এতদিনে হয় আশার সঞ্চার,
নিম জলে স্নান ক'রে পরম উৎসুক ভ'রে
বসিলাম হৃষ্টমনে করিতে আহার।
ধন্য অন্নরূপা দেবী ! তোমার চরণ সেবি'
বাঙ্গালী—বাঙ্গালীরূপে দেয় পরিচয়,
বলিয়া "ভেতো বাঙ্গালী" অন্য জাতে দিক্ গালি
আমি চাই পাইতে সে বাঙ্গালী হৃদয় !

বাঙ্গালীর প্রাণ অন্ন শক্তি-রূপা তুমি ধন্য
তোমার প্রসাদে পাই জ্ঞান বুদ্ধি বল,
ঘরে যদি ভাত থাকে বাঙ্গালী ডরায় কা'কে
অসাধ্য সাধিতে পারে নিমেষে কেবল।
ভাত খেকো বাঙ্গালীরা যত দীন হোক্ তারা
তথাপি বাঙ্গালী যশ গায় ত্রিভুবন
এ হেন বাঙ্গালী আমি ভাতের থালায় নমি
বহুদিন পরে পুনঃ করিনু গ্রহণ।
পরম উৎসাহেতে প্রথম গ্রাসের সাথে
মুখে তুলি' লইলাম প্রথম ব্যঞ্জন
কাঁচা নিম পাতা বাঁটা— কে জানিত আগে এটা
মুখের বিকট ভঙ্গি কে করে কল্পন !
শুধাইনু গোষ্ঠদা'রে "কিবা নাম ইনি ধরে
কতদিন হইয়াছে এর আবিষ্কার ?"
মৃদু হেসে কন তিনি— "চাট্‌নি নামীয় ইনি
'প্রতিষ্ঠানে' নব জন্ম হোলো দিন চার।
নিম পাতা, তেঁতুলেতে, কাঁচা লঙ্কা, লবণেতে,
মিশিয়া হয়েছে এই অপূর্ব্ব চাট্‌নি,
প্রতিষ্ঠান কর্ম্মীদলে খাই সবে কুতুহলে—"
আমি কই—"থাম দাদা ! তোমারে বাখানি !
ধন্য এর আবিষ্কর্ত্তা ধন্য তার অনুবর্ত্তা
প্রণমি তাদের পায় আমি করযোড়ে—"
এত বলি থালা হ'তে রাখিলাম টেবিলেতে
অপূর্ব্ব চাট্‌নি ধনে পরম আদরে !

Scanned with CamScanner

অতঃপর প্রীত মনে বেগুন ঘাঁটের সনে
ভাত দিয়া করিলাম উদর পূরণ,
মশুরীর ডা'ল আরো করিল সাহায্য বড়ো
সরাসরি করিবারে গলাধঃকরণ।
হইলে কা'রো বসন্ত কবিরাজ যশোবন্ত
পুরাকালে করিতেন আহার্য্য বিচার,
ভাজা ও বেগুন, সিম মশুরীর ডাল, ডিম,
মাছ না হইত কোনো রোগীর আহার।
এবে সব চমৎকার নব্য তথ্য আবিস্কার
নব ভিটামিন বার্ত্তা—বিজ্ঞানের বল,
বেগুন ও সিম মাঝে পুরা ভিটামিন রাজে
অতএব হোক্ উহা রোগীর সম্বল।

* * *

রোগীদের সংখ্যা দেখি চারুদার হয় ভয়,
কহিলেন, "তোমরা সবই মজাবে নিশ্চয়।
বেড়া দিয়ে ঘেরি তবু আশা নাহি পাই মনে,
হরিপদ ছিল ভালো—জুটে সেও তোমা সনে।
এখন তোমরা কর স্থান পরিবর্ত্তন
রহ সবে এক পাশে সংশ্রব কর্ত্তন।"
নয়জনে জুটিলাম এক গৃহে এক ঠাঁয়—
নব গ্রহ শোভে যেন বিক্রম রাজসভায়।
মাদ্রাজী বেলায়ুধন আর সুরেন বাবু
দু'জনেই খুব বেশী হ'য়েছিলেন কাবু।

তাহারও উপরে ছিল বন্ধু হীরেন সেন,
আমাদের বহু আগে তিনি হেথা এসেছেন।
চতুর্থ স্থানের দাবী করিবারে পারি আমি,
চক্রবর্ত্তী ভ্রাতৃদ্বয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানি।
হরিপদ সবা মাঝে সমধিক ভাগ্যবান,
জ্বর কিংবা উপবাস তাহারে করেনি ত্রাণ!
গোষ্ঠ দা' ও রাজেশ্বর সেবক মাঝেতে গণ্য
রাজেশ্বর—বেলায়ুধে, গোষ্ঠ দা'—সবারে অন্য।
বিহার প্রদেশ মাঝে দ্বারবঙ্গ নামে স্থান,
সেথা হ'তে রাজেশ্বর হেথা হন অধিষ্ঠান।
বালক কথায় পাকা—কাজেও সে মন্দ নয়,
মাদ্রাজী-বিহারী-প্রীতি বড় উপভোগ্য হয়।
প্রথম অবস্থা যবে সবাকার গেল কেটে,
ছাপাখানা গোষ্ঠ দা'রে বহু কাজ দিল বেঁটে।
তিনি যবে চলে যান—একাকী রাজেশ্বর,
সকলের সেবা ভার লইলেক অতঃপর।

* * *

সুরেন দা'র অসুখের না পাইতে সংবাদ
বৌদি পাঠান তাঁরে করি বহু আহ্লাদ—
কুমীর ডিমের ওষুধ আর কুলের আচার,
—বসন্তের প্রতিষেধক—মুখশুদ্ধি আর—।
হাসিয়া কহেন তিনি—"আগে কেন আসে নাই,
তা হ'লে এ পোড়া রোগে কভু কি আমি ডরাই!
যখন পাবেন তিনি এই শুভ সংবাদ,
তখন ঠেকাতে তাঁরে - গালি খেতে কার সাধ।

Scanned with CamScanner

তাঁহার পুত্রের পত্রে জানি মোরা অতঃপর,
তাঁহারে ঠেকায়ে রাখা বড়ই সে দুষ্কর।
ভাঙ্গেন এটা ও সেটা—গালি দেন কভু কা'রে,
মারাত্মক নহে এটা—বুঝাইতে কেহ নারে।
এদিকে আমরা সবে করি সদ্ব্যবহার,
তাঁহার প্রেরিত মিঠা কুলের আচার।

*   *   *

বেল খেতে উপদেশ দিয়াছেন দাদা গোষ্ঠ,
ইহাতে সবার নাকি পরিষ্কার র'বে কোষ্ঠ।
মহানন্দে সবে মিলে তাই মোরা খেয়ে বেল,
মাটিতে নর্দ্দমা কাটা পায়খানায় দিই ঠেল।
বেল খেয়ে বেলায়ুধ পড়ে মহা ফাঁপড়ে,
কি জানি কখন নষ্ট করে বুঝি কাপড়ে।
বারে বারে তাই তা'রে যেতে হয় পায়খানা,
প্রতিবারে যায় বুজে এক হাত কাটাখানা।

*   *   *

বেলায়ুধন রাজেশ্বর বেধে যায় ঝগড়া,
—রাজেশ্বর আদেশে সে কেন নাহি দেয় সাড়া।
রাগ ক'রে রাজেশ্বর বেলায়ুধে টানে গিয়া,
সে কহে—"এ কিয়া হ্যায়! রাজেশ্বরজী! এ কিয়া!"
রাজেশ্বর বলে—"এই মাষ্টারজীর আদেশ,
তিনবেলা তোমা স্নান করাইব আমি বেশ।
বাধা যদি দাও তুমি আমি তাহা না শুনিব,
নিশ্চয় ঠাণ্ডা জলে তিনবার চুবাইব।

বার্ত্তা শুনি বেলায়ুধ বিষম ফাঁপড়ে পড়ে,
'যা হবার হবে' ভেবে বিছানাটা রয় ধ'রে।
অতঃপর রাজেশ্বরে উপজিল মহারোষ,
বেলায়ুধ উপরে তার প'ড়ে গেল আক্রোশ!
নাইতে খাইতে শু'তে বেলায়ুধে না জিগায়,
বেলায়ুধ ভাবে আর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যায়।

*   *   *

হরিপদ ভায়া মোর রাত্তিরে রুটী খান,
নিতুই তাহার ভাগে প'ড়ে যায় বড় টান।
রাজেশ্বর বলে—"দাদা, তিনখানা সবে পাই,
বহু অনুনয়ে আনি পাঁচখানি তোমা ঠাঁই।
এতে যদি না কুলায়, তবে আমি অপারগ
ভাত ডাল খাও দাদা, সাদাসিধা কর ভোগ।"
রাগিয়া কহেন তিনি—"মর গিয়ে, আন তাই—"
"এইটুক তরকারী?" "কি বিপদ! দূর ছাই!"
রাজেশ্বর কহে—"দাদা, কি করি তাই বল না,
"বন্ধুজীর" ইচ্ছা এই—বেশী ভাত খেতে মানা।
একবার ভাত চাই—রাগের নাই অন্ত,
গোঁসাইজী কন হেসে—'ভাত যে বাড়ন্ত!'
তরকারী চাই যদি লেঠা আরো বেড়ে যায়,
'স্পেশাল সালুন' ও যে, সবই ত, দেছে হায়।
এইখানে বলে রাখি, রাজেশ্বর অনুযোগে,
বেগুনের ঘ্যাঁট বন্ধ হয়েছে ক'দিন আগে।
সেই হ'তে রোগী তরে স্পেশাল সালুন হয়,
এরূপ অপূর্ব্ব চীজ চাহিলে কি মিলে হায়!

Scanned with CamScanner

ধন্য হে উড়িষ্যাবাসী টিকিধারী গজানন,
স্বরূপ কেমনে করি পাপ মুখে বর্ণন !
বাঙ্গালীর পাকঘর নিলে ভার যবে হায়,
মা লক্ষ্মী মানে মানে সেই দিনে কাশী যায় !
তোমার মধুর হাতে সুমধুর রাঁধ যাহা,
তাহার অপূর্ব্ব স্বাদ ভুলিতে কি পারি আহা !
তব হাতে রান্না খেয়ে বাঙ্গালী শুকায়ে যায়,
উড়িয়ার ভুঁড়ি কিন্তু বাড়ে ঠিক জালা প্রায় !
তৈল চক্‌চকে তনু দিব্য হৃষ্টপুষ্ট,
মুখে যার কথা নাই সেই আরো দুষ্ট।
প্রথমে আসেন যবে—সম্বল বটুয়া,
লম্বা টিকি সহ আর পানের ডিবুয়া।
গালভরা গুয়া পান, ফেলে পিচ্ হেথা সেথা,
বিনয়ের অবতার, মুখে নাহি সরে কথা।
স্বরূপ প্রকাশে যবে পাকঘর হাতে পায়,
সকলের সেরা ভোগ তাহার গহ্বরে যায়।
এ হেন গুণের নিধি করে যবে রন্ধন !
বৃথা তব অনুযোগ ! বৃথাই এ ক্রন্দন !

* * *

রোগীদের বরাদ্দ যে দিনে দুধ পোয়া তিন,
উড়িয়ার ঝুঁটি তাই ফুলে উঠে দিন দিন।
প্রতি জনে দেড় পোয়া তিনবারে দেয় মেপে,
বাকিটুক্ ?—ভরে পেটে দুধ দধি ঘোলরূপে !

খাতাতে লিখায় কিন্তু ঠিক যাহা বরাদ্দ,
নচেৎ কেমনে হয় ভূতের পিতৃ-শ্রাদ্ধ !
একদিন রাজেশ্বর যা থাকে বরাতে ব'লে,
সবিশেষ বিবরণ মাষ্টারজীর কানে তোলে।
মাষ্টার বলেন "তবে আজি হ'তে পোয়া দেড়
করিয়া দিলাম আমি বরাদ্দ রোগীদের।"
'কীচেন' মালিকগণ আঁধার করিয়া মুখ,
রাজেশ্বরে পাড়ে গালি, বুক করে ধুক্ ধুক্।
উড়িয়ার টিকি নড়ে—ফন্দী খুজিয়া পায়,
দুধেতে আধেক জল মিশায়ে রাখিল তায়।
সন্ধ্যার খাবার সাথে দুধ যবে দিল আনি,
দেখি হায় ! দুধ রূপে বাটী ভরা সাদা পানি !
বড় দাদা রেগে খুন, কন্ শেষে হাত নেড়ে,
"ব্যাটার টিকিটা ধরে দেয় কেহ ভুঁড়ি ফেঁড়ে,
তবে মোর রাগ মেটে—ব্যাটা পাজি উড়ে ভূত,
চাল্‌তা গাছের তলে হাসে ব্যাটা অদ্ভুত।"
অবশেষে রাগ ক'রে মশারীটা ফেলে দিয়ে,
তাড়াতাড়ি বিছানায় গড়াগড়ি দেন শুয়ে।

* * * * * *

রোগের কারণে কা'রো রাত্রে হয় না ঘুম,
সেহেতু নিতুই স্নানে প'ড়ে যায় মহা ধুম।
কলে জল কম আসে হরিপদ পায় ভয়,
—কেমনে এটুকু জলে সকলের স্নান হয় ?

Scanned with CamScanner

রাজেশ্বর আরো তার মাথা দেয় বিগড়িয়ে,
বাল্‌তি মাপিয়া জল দেয় তারে নিজে গিয়ে।
রাত্রিকালে শুয়ে শুয়ে করি নানা কল্পনা,
ঘুম যে আসে না হায় কি করি তাই বল না ?
বড় দা' লইয়া আলো মসারীর মাঝখানে,
কঠিন চপেটাঘাত মশাদের প্রাণে হানে।
বেলায়ুধ মাঝে মাঝে কড়াই লইয়া হাতে,
অজয়ের বান হেন গর্জ্জন করয়ে তাতে।
রমেশ দা থেকে থেকে হেঁকে কন "মাগো তারা।"
ছোট ভাই সাথে সাথে মশারীটা দেন ঝারা।
হৃদিপদ থেকে থেকে উঠে যায় বাহিরেতে,
বেলের মাহাত্ম্যে তার নিদ্ নাহি আসে রাতে।
আমি রই আলো জ্বেলে মনে ভাসে কত কথা !
নিরুপায়ে আন মনে লিখি—আর ভরে খাতা।
হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে চিন্তারাশি থেমে যায়,
বিকট গর্জ্জনে ট্রেন পশ্চিমের পানে ধায়।
আবার সকলি চুপ নিস্তব্ধ নিঝুম,
তবু মোর চোখে আজ আসে নাক' ঘুম।
বসন্তের আবাহনে মলয় পবন বয়
চুপি চুপি কানে কানে কত কি সে কথা কয়।
লণ্ঠনে নাহি তেল ঘর জুড়ে আঁধিয়ার
বুকে তবু আলো জ্বালা একখানি মুখ কা'র !
দু'খানি চটুল আঁখি কেবল নয়নে ভাসে,
নয়নে নয়নে কথা কয় আর শুধু হাসে—

* * * *

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি হাসিছে ভোরের আলো,
রমেশ দা' কন কা'রে মশারীটা তুলে ফেলো।
মনে মনে দুর্গা স্মরি' উঠে পড়ি তাড়াতাড়ি,
আজিকে পাইব মুক্তি—কলিকাতা যাব ফিরি।
বিছানা কাপড় আদি যত কিছু—কাচি জলে,
'ক্লোরিনে' ডুবায়ে পুনঃ রৌদ্রে দিই যে মেলে।
অবশেষে চারু দাদা আসিয়া দেখেন দেহ,
আমারে দিলেন মুক্তি পরেশ বাবুর সহ।
এক সাথে এসেছিনু আবার চলিনু দোঁহে,
পঞ্চদশ দিন স্মৃতি রহুক অক্ষয় হয়ে।
আজি মোরা চলে যাই—লহ প্রীতি-দোঁহাকার,
অসময়ের বন্ধুজন সবে করি নমস্কার।

———

(প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, সোদপুর, ৩রা মার্চ্চ ১৯৩৬)

['কর্ম্মী আবাস'—খাদি প্রতিষ্ঠান (১৫ নং কলেজ স্কোয়ার) এর কর্ম্মী আবাস।
'প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল'—অন্যতম বিশিষ্ট গান্ধীবাদী পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তের আবিষ্কৃত দেশীয় ঔষধাবলী দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশিত পন্থায় এখানে অসুস্থ কর্ম্মীদিগকে চিকিৎসা করা হয়।
'চারুদা'—খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মসচীব। 'বড়দা'—সুরেনবাবু।
'মাষ্টারজী'—প্রতিষ্ঠান কর্ম্মী, সোদপুর প্রতিষ্ঠান হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। 'গোষ্ঠ দা'—সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেসের কর্ম্মী।
'বন্ধুজী'—সোদপুরের প্রতিষ্ঠান পাকশালার ভারপ্রাপ্ত পাচক।]

উপহার

শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ

খাদি প্রতিষ্ঠান, সোদপুর।

দুঃসহ ব্যথার জ্বালা—বিষাদিত সর্ব্বজন
তুমিই ভুলাতে ব্যথা, তুলি হাসি-প্রস্রবন।
আজি তাই সযতনে গাঁথা এই কথা-হার
কমল করেতে তব দিই শ্রদ্ধা-উপহার॥

[খাদি প্রতিষ্ঠান, সোদপুর]
৩-৩-৩৬

[সোদপুর প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে লিখিত কবিতা কয়টি (মানসী ৬১-৭৯ পৃঃ) প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়কে উৎসর্গিত]

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্তের রাজনৈতিক জীবনের ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ১৯২১ সালে সালার এডওয়ার্ড উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্কুল বয়কট করেন, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক রূপে বিলাতী কাপড়-এর দোকানে, আবগারী দোকানে পিকেটিং, গ্রামে গ্রামে দল বাঁধিয়া কংগ্রেস তহবিলের জন্য ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ, বিভিন্ন নেতাদের আগমনে সভা সমিতিতে যোগদান করেন। সালারে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় ভর্ত্তি হন। এই সময়ে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সর্ব্ব-ভারতীয় বিভিন্ন নেতা বহরমপুর, সালার, কাটোয়া আসিলে সেই সমস্ত জনসভায় ইনি যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে ইহার পিতা জাতীয় বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় হাই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আদেশ করেন। ইনি দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এবং পিতার আদেশ অমান্য করায় পিতা রাগান্বিত হইয়া ইহাকে বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করেন। ইনি সালার খাদি আশ্রমের কর্ম্মীরূপে আশ্রয় পান। জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ, খাদি আশ্রমের কাজ, সুতাকাটা, ট্রেণ কালেকশন, একবেলা কর্ম্মীদের জন্য রন্ধনের ভারও ইহার উপর পড়ে।

Scanned with CamScanner

১৯২৫ সালে গৌড়ীয় সর্ব্ব বিদ্যায়তনের অধীনে বহরমপুর
কেন্দ্রে সালার জাতীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া
প্রথম বিভাগে পাশ করেন। বাঁকুড়ায় গঙ্গাজলঘাটী অমরকানন
আশ্রমে কিছুদিন থাকিয়া আশ্রম পরিচালন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের
ঐতিহাসিক শবযাত্রায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করেন। এই
বৎসরই প্রথম কলিকাতায় (D. I B.) গোয়েন্দা বিভাগের
নজরে পড়িয়া জবানবন্দী দিতে বাধ্য হন। পুলিশের পাকা
খাতায় ১৭ বৎসর বয়সেই নাম লিখিত হয়। এরপর সালার
খাদি আশ্রমের সর্ব্বসময়ের কর্ম্মী হিসাবে বহু দায়িত্ব স্বেচ্ছায়
গ্রহণ করেন। সূতাকাটা, তাঁতবোনা, সূতা রং করা, গ্রামে
গ্রামে কাটুনীদের কাছে তূলা পৌছাইয়া দেওয়া সূতা সংগ্রহ
করিয়া আনিয়া তাঁতীদের দ্বারা খদ্দর বোনাইবার ব্যবস্থা করা,
বহরমপুর, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং খদ্দর
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিশু বিভাগে
শিক্ষকতা, বয়স্ক নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, আশ্রমের হিসাবপত্র
রক্ষা করা ইত্যাদি কাজের ভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে কাটোয়ায় ডাঃ গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং
জীতেন্দ্রনাথ মিত্রের আহ্বানে বর্দ্ধমান জেলার মোরগ্রামে একটি
চরকায় সূতা কাটার কেন্দ্র স্থাপন করেন। জীতেনদার প্রচেষ্টায়
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর পরিচালিত "দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির"
একজন প্রচারক কর্ম্মীরূপে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। পল্লী

সংস্কার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতা
দেওয়া অভ্যাস করেন।

১৯২৭ সালে আশ্রমের অবস্থা শোচনীয় হইলে পুনরায়
সালারে আসিয়া একাকী আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এই সময় ইঁহাকে কলিকাতায় যাইয়া দেশবন্ধু
পল্লী সংস্কার সমিতির স্থায়ী ল্যান্টার্ণ লেকচারার হিসাবে যোগ-
দান করিতে আহ্বান করেন। গুণীবাবু, জীতেনদা ও বৃহত্তর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের এই সুযোগ ত্যাগ না করিতে ইঁহাকে
বিশেষভাবে উপদেশ দেন। কিন্তু অসময়ের আশ্রয়স্থল
"সালার খাদি আশ্রমের', দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া
ইনি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার 'আশা পরিহার করেন।
১৯৩০ সালে একক ইঁহার উপর আশ্রমের দায়িত্ব থাকায় নিজে
সরাসরি আইন অমান্য করিতে না পারিয়া আশ্রমের কাজের
সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য করার জন্য গ্রামে গ্রামে জনসভা
করিয়া ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস
অফিসে পাঠাইতে থাকেন।

১৯২৬ সালে ইনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক
সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯২৭ সালে সালার কংগ্রেস কমিটির
সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সভ্য
নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস হইতে
ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত
কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনে

সভাপতি মতিলাল নেহেরুর "স্বায়ত্ব শাসন দাবী" প্রস্তাবের
বিরুদ্ধে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিবাদ এবং পূর্ণ স্বাধীনতার
দাবী জহরলালের সমর্থনে উত্থাপিত হয়। দারুণ উত্তেজনার
মধ্যে রাত্রি ১২ টায় ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটে মূল প্রস্তাব
গৃহীত হইলেও নেতাজীর বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বে ইনি মুগ্ধ ও অভিভূত
হন। এই সময়ে একবার সারা বাংলাদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ বা
অন্নকষ্ট হয়। তখন ইঁহার আগ্রহে ও সহযোগিতায় স্থানীয়
সরকারী কর্তৃপক্ষ সালার খাদি আশ্রমেই একটি ত্রাণকেন্দ্র
স্থাপন করিয়া ইঁহারই উপর তার পরিচালনভার অর্পণ
করেন। ৫ মাস যাবৎ এতদঞ্চলের দরিদ্রগণকে রেঙ্গুন হইতে
আমদানী করা আতপ চালের খুদ বিতরণ করেন। অসহায় বিপন্ন
বিদেশী রোগীকে আশ্রমে আনিয়া সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
বহুবার ইনি করিয়াছেন।

১৯৩০ সালের মধ্যে আরো কয়েকবার স্থানীয় পুলিশ,
গোয়েন্দা পুলিশ আশ্রমে হানা দিয়া যথারীতি ইঁহার জবান-
বন্দী গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন প্যাক্ট-এর সময় বহরমপুরে
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য
হিসাবে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস হইতে ডেলিগেট
হিসাবে যোগদান করেন। প্রদর্শনীতে নিজ কেন্দ্রের খাদি ষ্টল
পরিচালনাকালে ষ্টল পরিদর্শনে আগত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং
চারণ কবি মুকুন্দদাসের সহিত ইনি বিশেষভাবে পরিচিত হন।

কান্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কনফারেন্সেও অনুরূপ ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে নেতাজি সুভাবচন্দ্র কাটোয়া আসিলে সেই জনসভায় ইনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নেতাজীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবাঞ্ছিত ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসাবে ইঁহার উপর মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বহিস্কার আদেশ জারি করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া ইনি মুর্শিদাবাদে আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে জনসভা করার সময় শিমুলিয়া গ্রামে গ্রেপ্তার হন। কান্দী S. D. O. কোর্টে বিচারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কান্দী সাব জেল, বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেল, দমদমের তিনটি জেল ঘুরে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দুই বৎসর পরে কারামুক্ত হন।

সালারে ফিরে এসে দেখেন আশ্রমের অবস্থা মুমূর্ষু। তিনি ইহার দেনা আদি পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া আশ্রম উঠাইয়া দেন। এই সময়ে বীরভূম কনস্পিরেসী কেস আরম্ভ হয়। যদিও ইনি ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন না, তথাপি যাহারা সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ইঁহার বাড়ী সার্চ করা হয়। এবং বীরভূম গোয়েন্দা পুলিশ ইঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

Scanned with CamScanner

বিহারে ভূমিকম্প হইলে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফ হইতে ইঁহার নেতৃত্বে দুইবার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুইটি দল মুঙ্গের, মজঃফরপুর, সমস্তিপুরে ত্রাণকার্য্যে যোগদান করেন। নিরোল অগ্নিকাণ্ডে মাসুন্দী গ্রাম হতে স্বেচ্ছাসেবক ও চাউলাদি সংগ্রহ করে ত্রাণ কার্য্যে পাঠান।

১৯৩৫–১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবে নানাস্থানে বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ২৪ পরগণা জেলার শিরাকোলে ঢেঁকিছাঁটা চাল ও সরিষার তৈল উৎপাদন কেন্দ্র, ফরিদপুর জেলার সিদ্ধিয়াঘাটে গাওয়া ঘি উৎপাদন কেন্দ্র বিহারে ফরবেশগঞ্জ ও সকরীতে ভয়সা ঘি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেছেন। আবার চালু অবস্থায় অন্য কর্ম্মীর উপর দায়িত্ব দিয়ে আর এক কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়াছেন। ভবানীপুরে বিক্রয় কেন্দ্র, কলেজ স্কোয়ারে বিক্রয় কেন্দ্র, মাণিকতলায় চামড়া বিক্রয় কেন্দ্র, পাঁচুন্দীতে কাঁচা চামড়া ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেছেন। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আদেশে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও নেপালের নানাস্থানে মড়াগরুর চামড়ার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

১৯৩৫ সালে দামোদর বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা হইলে খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সঙ্কট ত্রাণ সমিতির কর্মীরূপে বর্দ্ধমানের জুজুটিতে ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এক মাস যাবৎ ত্রাণ কার্য্য পরিচালনা করেন।

খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে সোদপুরে দুইবার সর্ব্ব-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমাগম হয়। সৌভাগ্যক্রমে দুইবারই পরিচর্য্যা ও অভ্যর্থনা বিভাগের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ইঁহার উপর পড়ে। সেই সুযোগে মহাত্মা গান্ধী, মৌলভী আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জহরলাল, নেতাজী সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ বহু সর্ব্বভারতীয় নেতার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাহচর্য্যও কিছুদিন পাইবার সৌভাগ্য ইঁহার হয়েছে।

একক সত্যাগ্রহী হিসাবে শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য কেতুগ্রাম থানায় আসিলে মাসুন্দীকে কেন্দ্র করে তাঁর পাদযাত্রার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করায় ইঁহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। ইনি আত্মগোপন করে বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যোগাযোগে গুপ্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৪৩ সালে বীরভূমে গ্রেপ্তার হয়ে কাটোয়ায়, পরে বর্দ্ধমান জেলে প্রেরিত হন। গুপ্ত আন্দোলনের সময় বর্দ্ধমান জেলায় Parallel Government স্থাপনের পরিকল্পনায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে দাশরথি তা এবং কাটোয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ইঁহার নামে বুলেটিন প্রচারিত হইত।

১৯৪৩ সালে বর্দ্ধমান জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আত্ম-গোপনকারী দাশরথি তায়ের সহযোগে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর দানে মাসুন্দীতে একটি গ্রুয়েল কীচেন স্থাপন ও পরিচালনা করেন।

কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক হিসাবে এবং বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী বিভাগের সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল ইনি কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করেছেন।

কবিতা রচনায় ইঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ কবিতাই ইঁহার গভীর দেশপ্রেমের পরিচায়ক। ১৯৪৩ সালে বর্দ্ধমান জেলে থাকাকালে ইনি বাংলা কবিতায় মীরার ভজনাবলী অনুবাদ করেন। পূর্ব্বেই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি "মানসী", ও "অরুণোদয়" নামে দুইটি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই দুইটি পুস্তকে স্বাধীনতা পূর্ব্ব এবং স্বাধীনতার পরবর্ত্তী কালের লিখিত কতক-গুলি করিয়া কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরাধনা নামে আর একটি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৯২১ হইতে ১৯৭০ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বৎসর ইনি কংগ্রেসের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকিয়া বর্ত্তমানে সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন ত্রাণ কার্য্যে, সমাজ সেবায় ও গঠনমূলক কাজে ইঁহার অবদান সামান্য নহে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইঁহার অবদান যথেষ্ট। কাটোয়া মহকুমার ও মুর্শিদাবাদ জেলার নানা স্থানে ইনি বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং নানা স্থানে নাট্য পরিচালনা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতাদি পরিচালনা করেছেন। ইনি ১৯২২ সাল হইতে আজীবন খদ্দর ব্যবহারকারী এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী।

শ্রীভক্তভূষণ সোম

এই লেখকের লেখাঃ

১। **মীরাবাঈ** মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
মীরাবাঈ-এর ৫০টি ভজনের বাংলা অনুবাদ।

২। **মানসী** মূল্য—দুই টাকা
স্বাধীনতা-পূর্ব্ব যুগের মানস-আলেখ্য, গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনী সম্বলিত।

৩। **অরুণোদয়** মূল্য—তিন টাকা।
স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী যুগের চিত্রাদি প্রতিফলিত। পাক-ভারত যুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত।
আরতি—স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের দুইটি কবিতার অনুবাদসহ।

৪। **আরাধনা** অনুবাদ কাব্য (যন্ত্রস্থ) বিভিন্ন দেবদেবীর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রাদি সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুদিত। ভক্ত কবীরের দোঁহা, হিন্দী কালিকীর্ত্তন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মমূলক কবিতার বাংলা অনুবাদ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner